ভূমিকা

হিন্দী সাহিত্যের সুমহান স্রষ্টা তুলসীদাস, সুরদাস, কবীর, মীরা—এঁরা এঁদের সৃষ্টির মাহাত্ম্যে চণ্ডীদাস-আদি বৈষ্ণব মহাজন এবং রামপ্রসাদ, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র-প্রভৃতি বাঙালী স্রষ্টার সঙ্গে, বাঙলা-ভাষা-ভাষীদের কাছেও একান্ত আদরের ধন। আমাদের ভাষায় ও সংস্কৃতিতে তাঁদের সমাদর ও প্রভাব কম নয়। আধুনিক কালে হিন্দী সাহিত্যের বহু নাম ও বহু রচনার সঙ্গেও আমাদের পরিচয় হয়েছে। অনেক সৃষ্টি ও অনেক স্রষ্টাই আমাদের বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার সামগ্রী ও পাত্র। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের প্রেমচন্দজীর নাম সাধারণভাবে বাঙালী পাঠকদের বিশেষ পরিচিত, এবং তাঁর কিছু রচনা বাঙলা দেশে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গেই সমাদৃত হয়েছে। কিন্তু সিয়ারামশরণ গুপ্ত মহাশয়ের নাম হিন্দী সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেখক হওয়া সত্ত্বেও বাঙালী পাঠকের তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি।

সিয়ারামশরণজী হিন্দী সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবি ও উপন্যাসকার। সিয়ারামশরণজী হিন্দী সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি মৈথিলীশরণ গুপ্তের অনুজ। কিন্তু জ্যেষ্ঠের সম্মানেই তাঁর প্রতিষ্ঠা নয়। তাঁর প্রতিষ্ঠা আপনার গুণে ও কীর্তিতে, স্বমহিমায়। তাঁর সম্পর্কে একজন বিখ্যাত হিন্দী সাহিত্য সমালোচকের কয়েকটি কথারপুনরুক্তি করে বলি—সিয়ারামশরণ গুপ্ত মহাশয় দীর্ঘকাল [পঁয়ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল] ধরে হিন্দী সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করে আসছেন। তাঁর সাহিত্যের গুণ ও পরিমাণ উভয়ই বিশেষ শ্লাঘার সামগ্রী। তাঁর তপঃপূত কাব্য ও সাহিত্য-জীবন এবং তার থেকে উদ্ভূত পবিত্র জীবন-দর্শন উভয়েরই পৃথক বৈশিষ্ট আছে। সেই বিশিষ্ঠতায় হিন্দী সাহিত্যে তিনি বিশিষ্ট।

আধুনিক হিন্দী কথাসাহিত্যে প্রেমচন্দজীর স্থান অবশ্যই সকলের পুরোভাগে। কিন্তু কোন মহৎ লেখকেরই সমস্ত রচনা মহৎ হতে পারে না,

এবং সে অসম্ভব প্রত্যাশা করলে লেখকের উপর প্রত্যাশার আধিক্যে অবিচারই করা হয়। প্রেমচন্দজীর একাধিক রচনা হিন্দী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিরোভূষণ। তাঁর মহৎ উপন্যাস 'গোদান' রচনা হিসাবে যত উৎকৃষ্ট, পাঠকের কাছে তার সমাদরও ততখানি। এ ছাড়াও তাঁর 'গবন', 'সেবাসদন' ও 'রঙ্গভূমি' প্রভৃতি রচনাগুলি হিন্দী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। হিন্দী সাহিত্যে এদের সমকক্ষ রচনা খুব কমই আছে। যে কখানি হয়েছে তার মধ্যে 'নারী', 'ত্যাগপত্র', 'চিত্রলেখা' ও 'শেখর' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কথাকার হিসাবে সিয়ারামশরণজীর রচনার মধ্যে একটি আশ্চর্য সরসতা ও সরলতা আছে। যদি পাঠক গুপ্তজীর রচনায় জটিল এবং প্যাঁচালো কিছু প্রত্যাশা করেন তবে পাঠকের সে প্রত্যাশা পূর্ণ হবে না। যদি পাঠক মনে করে থাকেন তিনি কোন সমস্যার উপস্থাপন করে তার সমাধানের ইঙ্গিত দেবেন তা হলেও সে আশা অপূর্ণ থাকবে। যদি পাঠক প্রত্যাশা করেন যে লেখক তাঁর রচনায় উপস্থাপিত চরিত্রকে চিরে চিরে বিশ্লেষণ করবেন তা হলেও সে আশার পরিপূরণ হবে না। যে হৃদয়-বেদনা থেকে রক্ত আপনি ক্ষরিত হচ্ছে সেই বেদনার কথা তিনি বার বার বর্ণনা করেছেন; কিন্তু সেই বেদনার কথা বর্ণনা করেও তিনি পুনরায় সে ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ করাতে চান না। আর সে কর্মে তিনি বার বার সার্থকতাও লাভ করেন। সমাজে তিনি যেমনটি দেখেছেন তেমনটিই দেখিয়েছেন। বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ভঙ্গিতে তিনি নিরালাজীর সঙ্গে এক পথের পথিক।

'নারী' উপন্যাসে যমুনা বলে একটি মেয়ের কাহিনী বিবৃত করেছেন লেখক। তার স্বামী বৃন্দাবন বিদেশে গেল। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সে ফিরল না। এতে সকলের এই ধারণা হল যে বৃন্দাবনের মৃত্যু ঘটেছে। পরে অবশ্য এ ভুল ধরা পড়ে। বৃন্দাবনের অনুপস্থিতিতে অজিত বলে একটি যুবক যমুনাকে অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে সাহায্য করে। অজিতের প্রতি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত যমুনা অজিতের সঙ্গে নিজের জীবন জড়িয়ে দিতে উদ্যত হয়ে উঠল। এদিকে শোনা গেল বৃন্দাবন শহরে ফিরে এসেছে। যমুনা স্বামীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে। অজিত গেছে শহরে বৃন্দাবনকে ফিরিয়ে

আনতে। ইতিমধ্যে অজিতের সম্পর্কে যমুনার নামে মিথ্যা বদনাম দিয়ে, মহাজন মতিলাল বৃন্দাবনকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে, পাওনা ধারের বদলে যমুনার যে সামান্য সম্পত্তি ছিল তা থেকে তাকে বেদখল করে দিল। বালক হল্লীর হাত ধরে পথে বেরুতে হল যমুনাকে ও শেষ পর্যন্ত অজিতের কাছেই তাকে আশ্রয় নিতে হল।

সিয়ারামশরণজীর 'নারী' উপন্যাসের সঙ্গে শ্রীজৈনেন্দ্র কুমারের 'ত্যাগপত্র' উপন্যাসখানির কথা অতি স্বাভাবিকভাবেই হিন্দী সাহিত্যের পাঠকের কাছে এসে যায়। দুটি রচনার মধ্যে মিলও যত গরমিলও তত। 'নারী' এবং 'ত্যাগপত্র' দুইই এক নারীর কাহিনী। 'নারী' যমুনার এবং 'ত্যাগপত্র' মৃণালের কাহিনী। যমুনা এবং মৃণাল এই দুই নারী-চরিত্রের গভীরে রয়েছে অতৃপ্তি। যমুনার চরিত্র সংগ্রামের ধাতু দিয়ে তৈরী নয়। কারণ যমুনার জীবনে কিছু তৃপ্তি কিছু অতৃপ্তি, কিছু নিষেধ কিছু স্বীকৃতি—এই দুইয়েরই মিশ্রণ ছিল। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই যমুনা বঞ্চিত হয় নি। আরম্ভে সে স্বামীর পূর্ণ প্রণয় পেয়েছিল, স্বামী চলে যাওয়ার পর সে পেয়েছিল শ্বশুরের স্নিগ্ধ স্নেহ। শ্বশুরের মৃত্যুর পর হল্লীর স্নেহে যমুনা জীবনের মধুর স্বীকৃতি লাভ থেকে বঞ্চিত হয় নি। তারপর পট পরিবর্ত্তন হল। স্বামীর উপেক্ষা, গ্রামের সমস্ত মানুষ, বিশেষ করে চৌধুরীর কটু ব্যবহার ও তিরস্কার তাকে ভোগ করতে হয়েছে। যমুনা পূর্ব জীবনে যা সুখ ভোগ করেছিল তার তুলনায় এ দুর্ভোগের পরিমাণ নগণ্য। এই কারণেই যমুনা একাধিকবার জীবনে বিচলিত হওয়া সত্ত্বেও জীবনের উপর বিশ্বাস হারায় নি। জীবনের চরম পরিণতির মুহূর্তে যখন তার জীবন স্বামীর ধ্যান ছেড়ে অন্য আর একজনকে গ্রহণ করতে উদ্যত, তখনও সে জীবনকেই স্বীকার করেছিল। তার জীবনে কামনার অতৃপ্তি ছিল। কিন্তু সেই অতৃপ্তি পরিপূরণের জন্য তো তার একটি সন্তানও ছিল। তার জীবনের বিশ্বাসে কোথায় একটি গভীর প্রশান্তি ছিল।

তবে এহ বাহ্য। ব্যঞ্জনের উৎকর্ষ তার স্বাদে। বাঙালী ও বাঙলা ভাষাভাষী পাঠক উপন্যাসখানি পড়লেই নিজেই প্রত্যক্ষভাবে তার আস্বাদ পাবেন। এবং আমার বিশ্বাস উপন্যাসখানি পাঠককে গভীর পরিতৃপ্তি দেবে।

'নারী' উপন্যাসখানি অনুবাদ করেছেন বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি-জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। সুধাকান্ত বাবুর নাম মহাকবি রবীন্দ্রনাথের পুণ্যনামের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু তাঁর এই কৃতিত্বের কথা সাধারণ বাঙালী পাঠক-সমাজের কাছে অপরিচিত। নিজের মাতৃ-ভাষায় যেমন একদিকে তার স্বচ্ছন্দতা, শালীনতা ও মাধুর্য রয়েছে তেমনি অন্যদিকে হিন্দী সমাজ, ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘ ও সুগভীর পরিচয় তাঁর অনুবাদ-কর্মকে এক অনন্যতা দিয়েছে।

একজন বিশিষ্ট সাহিত্যকারের রচনা একজন রসিক ও অভিজ্ঞ অনুবাদকের হাতে যে সুন্দর ও সুষ্ঠু রূপটি পেয়েছে তা বাঙলা ভাষাভাষী পাঠককে পরিতৃপ্তি দেবে বলেই আমার আন্তরিক বিশ্বাস।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

[১]

পোষ্টাপিসের পিওন একটি মাটির বাড়ীর সামনে এসে হাঁক দিলে, যমুনা বাঈ আছে?

কোন উত্তর না পেয়েও সে টের পেল ভিতরে কেঁউ আছে। নাকের উপরে ভাল করে চশমা তুলে ডাক উল্টে-পাল্টে দেখে, 'এই-ই' বলে সে বাড়ীর ভিতরে একটা প্যাকেট ফেলে চলে গেল।

বাড়ীর ভিতরে যমুনা গোবর দিয়ে একটি ঘর নিকোচ্ছিল। পিওনের কণ্ঠস্বর সে শুনেছিল। বহু বছর ধরে প্রতীক্ষিত এই স্বর কোন রকমে সে ভুলে ছিল। তবু চিনতে দেরি হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে মনের কোন নিগূঢ় আনন্দের নির্বাপিত দীপ তার রোমে-রোমে জ্বলে উঠল। তার এক হাত জলের ঘড়ায় আর অন্য হাত গোবরের উপরে যেমন ভাবে ছিল, তেমনি ভাবেই স্থির হয়ে রইল। যেন কোন বিশিষ্ট অতিথির আগমনে তার দেহের সমস্ত ক্রিয়ার ক্ষণেকের জন্য বিরতি ঘটল।

সে যখন বাড়ীর উঠানের দরজার কাছে গেল তার আগেই পিওন অনেক দূর চলে গেছে। গোবর-মাখা হাতে কেবল দুটি আঙুল দিয়ে ঐ প্যাকেটটি তুলে সে দেখল। —তিনি এত বড় চিঠি লিখেছেন! অনেক কথা ছোট চিঠিতে কেমন করে ধরবে। একথা সে ভাবল বটে, কিন্তু তার মন ভিতর থেকে বলে উঠল—না, এ তা নয়, তা নয়। কত বছর হল একটা কার্ড পর্যন্ত পাঠালেন না, এত বড় চিঠি কেমন করে লিখবেন? যদি লিখতে চাইতেন তবে কি লিখতে পারতেন না? আশে-পাশে জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর মত লেখাপড়া জানে দ্বিতীয় এমন কে আছে? একবার আব্দার করে আমাকে পড়াতে বসেছিলেন। এই কথা মনে পড়তেই যমুনার গৌরবর্ণ মুখ হঠাৎ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠল। হুঁঃ, আমাকে অন্য কাজ থেকে সরিয়ে এনে কাছে বসাবার একটা ছুতা মাত্র ছিল পড়ান! আমি মূর্খ, আমি কি আর পড়াশোনা করতে পারতাম। তাঁর সব ব্যাপারই এই রকমের।

ভিতরে কি আছে জানবার জন্য সে প্যাকেটটিকে ধীরে ধীরে টিপে দেখলে।—আরে, এ তো কোন একটা মুদ্রিত বই! তাঁর এত বড় চিঠি হতে পারে না, এ কথা তার প্রথমেই মনে হয়েছিল। তবুও সে খুব নিরাশ হল। ভিজে হাতে প্যাকেটের কাপড়ের মোড়ক পাছে নষ্ট হয়ে যায় এই বিচার সে ছেড়ে দিল—তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ওটিকে দেওয়ালের তাকের মধ্যে ফেলে দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

আবার ঘর নিকোবার জন্য বসে সে অনেক কিছু ভাবতে লাগল—উনি আমাকে ভুলে গেছেন, তবে আমিই বা কেন তাঁকে ভুলি না? কী করি, মাঝে মাঝে এমন হয় যে তাঁর কথা মনে এসেই পড়ে, ঠেকাতে পারি না। কে জানে আজ এই বই কে পাঠিয়েছে? হল্লী স্কুল থেকে ফিরে এলে তাকে জিজ্ঞেস করব। এত বড় বই তো সে কোথা থেকে আনতে পারে না। আনাতে হলে আমার কাছ থেকে দাম চেয়ে নিত না? তবে এটা কি?

হঠাৎ তার মনে একটা নতুন চিন্তা খচ করে উঠল। ভাবলে—কালী-মাতার কলকাতা তো খুব বড় শহর। আমাকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্য কোন ছাপাখানায় গিয়ে নিজের চিঠি যদি ছাপিয়ে নিয়ে থাকেন? শহরে গিয়ে সকলে শৌখীন হয়ে যায়। সেখানকার লোকে দাম দিয়ে বোতলের জলও কিনে খায়। এই চিঠি তাঁর হলেও হতে পারে। হল্লী এলে তাকে দিয়ে পড়াব। পড়তে পারবে তো? কেনই বা পারবে না। তাড়াতাড়ি না পারে ধীরে ধীরেই পড়বে। কিন্তু চিঠিটি তাঁরই যদি হয়, তবেই তো।

তার দেহে স্ফূর্তি জেগে উঠল। তাড়াতাড়ি নিকোনর কাজ সারল, মাটির জালায় কলসীর জল ঢেলে চট করে স্নান সেরে ফেলল এবং ভিজে চুলের বিন্দু বিন্দু জল ঝরাতে ঝরাতে উনুনের কাছে গিয়ে বসল।

রান্না তো প্রস্তুত, কিন্তু যে খাবে তার আসার ছুটি হলে তবে তো! এতক্ষণ ধরে চিঠি না-পড়াতে পারার রাগ গিয়ে পড়ল স্কুলের শিক্ষকদের উপরে। লেখা-পড়া শেখান তো ছাই, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেদের তিন প্রহর পর্যন্ত জল-টল কিছু না খাইয়ে আটকে রাখা। এরা কি নির্দয়! এইজন্যই আজকালকার ছেলেরা কিছুই লিখতে-পড়তে পারে না।

মা, কোথায় তুমি?

যমুনা দেখলে হল্লী এসেছে। কালির ছিটে পড়া মতন ছিট দিয়ে তৈরী কাপড়ের থলে বগলে চেপে আছে। ডান হাতে কাঁচের দোয়াত। মুখে তার এমনই প্রসন্নতা যেন এখনি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে।

যমুনা ঘরের ভিতর থেকে বললে, এসেছিস, অনেক দেরি করে ফেললি। আয়, রুটি তৈরী আছে।

একটি তাকে বইয়ের থলে ফেলে দিয়ে হরলাল তাড়াতাড়ি ঐ ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। হ্যাঁ, তার নাম হরলালই ছিল। এমন কি স্কুলের রেজিস্টারি খাতাতেও ঐ নাম ছিল। কিন্তু শিশুদের আর বালকদের নামের মাথায় বড় নামের বোঝা মানায় না, এই জন্য হরলালের পরিবর্তে সে হয়ে গেল 'হল্লা'! মায়ের কানে এটা কেমন করে সইবে? তাই মা তাকে 'হল্লী' বলে ডাকে।

ওখানে যাব? —হাসতে হাসতে হল্লী বলল।

স্বামীর সংবাদ আসা বন্ধ হয়ে যাবার পর থেকে যমুনার আচার-বিচার বেশ একটু কড়া হয়ে গেছে। হল্লী এইজন্যই ঐ কথা বলেছিল এবং এগিয়ে যাবার জন্য এক পা তুলেও ছিল, তবু যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। সঙ্গে সঙ্গে যমুনা বলে উঠল—কি করছিস, হাত পা না ধুয়ে, স্নান না করেই—

এখনি তুমি বললে আয় রুঠি খেয়ে নে।

তার মানে কি এইভাবেই রান্নাঘরে আসবি না নেয়ে, না ধুয়ে?

না মা, আজ খুব খিদে পেয়েছে। কাল স্নান করব—এখনি খেতে দাও।

যমুনা যেন তার কথা শোনেনি এমনভাবে বললে, বেশ বেশ, কাপড় ছাড়; আজ তাড়াতাড়ি স্নান করিয়ে দেব।

হল্লী জানত মা তাড়াতাড়ি কি আর স্নান করিয়ে দেবেন; যখনই স্নান করান, গা এমনভাবে রগড়াতে থাকেন যেন রান্নাঘরের কালো তাওয়া মাজছেন। বলল—

থাক, তোমার করাতে হবে না আমি নিজেই স্নান করে নিচ্ছি। আজ কি রান্না হয়েছে? শাক আর রুটি! আলু কেন রাঁধনি? না আজ আমি কিছু খাব না। রুটির সঙ্গে নুনের কুচিও নয়। তখন দেখব তুমি কি কর।

যমুনা বুঝিয়ে বলল, কাল হাটে গিয়ে আলু নিয়ে আসব, অনেক নিয়ে আসব, রেঁধে দেব। আজকের শাক খুব ভাল হয়েছে।

তুমি এইখানেই বসে বসে চেখেছ?

যমুনা হাসল। বলল, আমি তোকে আজ একটা অন্য ভাল জিনিস দেব।

হল্লী নিজের রুচির বস্তুসমূহের নাম মনে মনে চিন্তা করতে লাগল— লাড়ু, প্যাঁড়া, জিলাপি। সে ভেবেই পাচ্ছিল না অন্য এমন কি ভাল জিনিস হতে পারে। মনের ধাঁধা ঘুচোবার জন্য এদিক্-ওদিক চারিদিকে তাকিয়ে দেখল।

মাকে ঐ প্যাকেট তুলতে দেখে ভাবল এর মধ্যে খাবার কি বস্তু থাকতে পারে! কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই হেসে বলে উঠল, এসে পড়েছে! আমি আজকেই ভাবছিলাম এখনো পর্যন্ত এল না কেন।

যমুনার ক্ষীণ আশার তন্তুতে একটা ধাক্কার মত লাগল। শঙ্কিত হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, তুই কেমন করে জানতিস যে এই চিঠি আসবে?

চিঠি—চিঠি, কার চিঠি আসবার কথা ছিল? এটা তো পঞ্জিকা। আমি তোমার নাম দিয়ে একটা বেয়ারিং চিঠি পাঠিয়েছিলাম এটা পাঠাবার জন্য। ভেবেছিলাম আসে তো আসবে, না এলে ক্ষতিই বা কিসের। এই বলে মায়ের দিকে না তাকিয়েই সে ঐ প্যাকেট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। সে বুঝতে পারছিল না মোড়কটা কেমন করে কোন দিক দিয়ে খুলবে।

যমুনা ধমক দিয়ে বলল, বুঝিস না সুঝিস না, আর বলছিস এটা না সেটা না।

এবার সে চিঠির নাম মুখে আনতে পারল না।

প্যাকেটের কাপড়ের মোড়ক ছিঁড়ে হল্লী দেখল, এটা সেই জিনিসই যা সে চেয়ে পাঠিয়েছিল। ওর কাছে পঞ্জিকার চেয়ে বেশি লোভনীয় ছিল পঞ্জিকার ছবিগুলি।

বাঃ বাঃ, এই যে মহাদেব ঠাকুর পার্বতীর কাছে বসে আছেন। দেখ মা এঁর গলায় সাপ কেমন ভাল দেখাচ্ছে।

হল্লী বুঝতে পারল না কেন যে মা খুশী হচ্ছেন না। এমন ভাল

জিনিস সে এতদূর থেকে আনিয়েছে আর এক পয়সাও খরচ করতে হয়নি, এটা তো কম প্রশংসার বিষয় নয়। তবু মায়ের মুখ থেকে একটিও কথা বার হচ্ছে না, সত্যিই এটা তার পক্ষে চিন্তার বিষয়, তবু এই নিয়ে বিশেষ চিন্তা করবার অবসর তার ছিল না। সে ভাবছিল খাওয়া-দাওয়ার ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত হয়ে কখন স্কুলে যাবে। সহপাঠীদের যথাসম্ভব শীঘ্র এই বৈভব দেখাতে পারলেই তার আনন্দ। সেখানে কোন বেচারার কাছে এমন একটি পঞ্জিকা নেই।

স্নান করতে বসে অভিযোগ করতে ভুলে গেল যে জল খুব ঠাণ্ডা। খেতে বসে ভুলে গেল যে আজ তার রুচি ছিল অন্য কোন রান্নায়, আর একটা বড় বিষয়ও তার মনে পড়ল না যে প্রতিদিনের মত মায়ের সঙ্গে খাওয়া নিয়ে জিদ আর আব্দার করতে হবে।

হল্লী প্রস্তুত হয়ে বিকালের ক্লাসের জন্য স্কুলে চলে গেল। সে-বেলা যমুনা কিছু খেল না।

মনের মধ্যে যখন দুঃখ-দেবতার আগমন হয় তখন তাঁকে পেয়ে মানুষ নিজের স্নানাহারের কথা ভুলে গিয়ে তাঁর অভ্যর্থনা করে। দুঃখের মধ্যে এমন আনন্দ যদি না থাকত, তাহলে কেই-বা তাকে গ্রহণ করত? যমুনার এই দুঃখ নূতন নয়। কোন বন্ধ পেটরায় রাখা পুরাতন খেলনার মতন আবার তারা এসে ওর কাছে যেন এই সময় নূতন হয়ে দেখা দিল। অতীতের স্মৃতিগুলোকে পরস্পর জোড়া দিতে দিতে কখন যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে সে খেয়াল তার ছিল না।

মা—মা, এখনো পর্যন্ত প্রদীপ জ্বালনি?

যমুনা এতই তন্ময় ছিল যে হল্লীর কথা শুনে চমকে উঠল—জেলে দিচ্ছি, বলে সে ওঠে দাঁড়াল।

প্রদীপের আলোয় হল্লী দেখতে পেলে যে-থালায় সে দুপুরে খেয়ে গিয়েছিল সে-থালা যেখানকার সেখানেই পড়ে আছে। শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, আজ তুমি খাওয়া-দাওয়া করনি?

না, শরীরটা ভাল ছিল না। এখন তোর সঙ্গে বসে খাব। —বলতে বলতে যমুনার চোখ ছল ছল করে উঠল। মাঝখানে একটানা একা বসে থাকতে থাকতে কয়েকবার তার মনে হয়েছিল যে অনেকদিন আগে

কোন কারণে সে যখন না খেয়ে অন্য ঘরে শুয়ে থাকত, তখন তার স্বামী শ্বশুরের দৃষ্টি এড়িয়ে তাকে সাধবার জন্য কেমন করে ঘুরপাক খেত। আজ নিজের কথা নিজেকেই বুঝে নিতে হবে। এখন সে তো আর ছোট্ট মেয়েটি নয় যে কেউ এসে তাকে সাধবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর মাকে খুশী করবার জন্য হল্লী সেই পঞ্জিকা নিয়ে তাকে দেখাতে বসল। তার মনে হল যে সত্যই হয়তো মায়ের শরীর ভাল নেই। মাকে সঙ্গ দেবার জন্য, বাইরে গিয়ে খেলাধূলার লোভ এসময় তাকে ছাড়তে হবে। সে এখনো বালক, তবু তার মধ্যে ভাবী পিতৃত্বের প্রকৃতি কেনই বা থাকবে না? যমুনার কাছে গোপন রইল না যে তার ছেলে তার দুঃখ বুঝতে পেরে বড়দের মতো তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইছে।

আগে এটা দেখে বল তো এটা কি?—পাতা উল্টে হল্লী একটা খেলনার ছবি যমুনাকে খুলে দেখালে।

দেখে যমুনার এত কৌতুক হল যে বুঝতে না পারার ছল করার কথাও তার মনে এল না। এই জিনিস তার স্বামী একবার কোন তীর্থস্থান থেকে এনেছিল। তাতে রাম আর সীতার ছবি ছিল, এইজন্য ঐ বাড়ীতেই নিত্যপূজার সামগ্রী সমূহের সঙ্গে সেটারও স্থান হয়ে গেছে। সে বলল—

এ তো পূজা করার মূর্তি, সামনে দশানন, তাই মা সীতা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছেন! আর একদিকে ভগবান রয়েছেন, তাঁকে এইদিকে ঘুরিয়ে দে, তাহলে তো ইনি (সীতা) তাঁর দিকে ঘুরে দেখবেন।

এটাকে কেমন করে ঘুরিয়ে দেব, এটা তো ছবি! নিজের জন্য আমি আর একটা এমন মূর্তি চাই। স্নান করে নিত্য ফুল-চন্দন দেব। কিন্তু এর মধ্যে আরও অনেক ভাল জিনিস আছে। তুমি আমাকে একটা টাকা দিলে এখানে বসেই আমি অনেক জিনিস আনিয়ে দেব। দেখ, টাকা দেবার কথা বলতেই চুপ করে রইলে?

এই বইয়ের জন্য তুই তো আমার কাছে কিছু চাস নি, তবু কেমন করে এল?

এটা বই না, এটা পঞ্জিকা। এর দাম দিতে হয় না। চিঠি লিখলেই পাওয়া যায়।

দাম না দিয়েই তুই কারো জিনিস নিবি? দাম পাঠিয়ে দিস।—বলে যমুনা উঠে দাঁড়াল। তাকে গরু মোষের তদারক করতে হবে।

[২]

ছয়-সাত বছর পূর্বের কথা। যমুনার স্বামী বৃন্দাবনকে শহরে যাবার কল্পনা পেয়ে বসল। বাড়ীর আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল না। গরু, মোষ, মৌরসী জমি আর ক্ষেতে বাঁধানো কুয়ো—একসঙ্গে ক'জন লোকের থাকে? একজন কৃষকের পক্ষে এর বেশি আকাঙ্ক্ষা দেখে বৃদ্ধ বাবা খুবই উদ্বিগ্ন বোধ করল। সে বলল—

পনরো টাকা মাইনের জন্য বিদেশে গিয়ে কুলীর নাম কেনা কি সম্ভ্রমী মানুষের উচিত? বাড়ীতে গো-মাতার সেবা করবে না, বাইরে গিয়ে অন্যের জুতো চাটবে। ধিক্ আজকালকার ছেলেদের এই মনোভাবকে!

তবুও সেকেলে বাপের এই কথা ছেলের মাথায় ঢুকল না। যমুনার কান্নাকাটির জন্য অবশ্য একবার চিন্তা করতে বসল। যমুনা ছিল রূপসী, তার কোলে একটি শিশুও ছিল। এইসব ছেড়ে যাবার কথা বৃন্দাবনের মনে উদ্বেগ সঞ্চার করল। কিন্তু যার সঙ্গে যাওয়ার কথা পাকাপাকি স্থির হয়ে গেছে, তাকে সে কী বলবে? পুরুষ হয়ে স্ত্রীর কথা মেনে চলা খুবই লজ্জার বিষয়। অতএব হঠাৎ একদিন রাত্রিতে গোপনে সে চলেই গেল। গোড়ায় গোড়ায় দু-চারটি চিঠি তার কাছ থেকে এসেছিল। কলকাতার একটি কারখানায় তার আশ্রয় জুটেছে। বাপ মনে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করল এই ভেবে যে তার ছেলে দূর দেশে গিয়ে কোন একটা জায়গায় আশ্রয় পেয়েছে। কত দূর যে সে জায়গা তা সে জানত না। হয়তো সেখানে যাবার রেলভাড়া চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা লাগে। ওখানে এখানকার কোন মানুষ স্বপ্নেও যায়নি। যদি কেউ বা গিয়েও থাকে, তা হলেও যাওয়া এক কথা, আর গিয়ে সেখানে আটকে থাকা একেবারে অন্য কথা। বাপের মনেও বিদেশে যাবার স্বপ্ন পূর্বেই জেগেছিল। সে

বাইরে কোন দিন যায়নি। তবু তার বৃন্দা যে বিদেশে যাবার সৌভাগ্য পেয়েছে এতে তার সন্তোষ হল। কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টি হবার পর যেন তার রোদে পোড়া দেহে শীতল বায়ুর একটা স্পর্শ পেল। কিছুদিনের জন্য সে অন্য সব কাজ ভুলে গেল। সে এমন লোকের সন্ধান করত যাদের সে নিজের বৃন্দার লেখা শহরের বিচিত্র বিষয় শোনাতে পারে।

বিষয় যতই অদ্ভুত হোক না কেন কিছুদিনের মধ্যেই সাধারণ হয়ে যায়। বৃন্দাবনের দু-চারটি চিঠি বেশি দিন কাজ চালাতে পারেনি। বাপের মন প্রথমে ভেঙে পড়ল, তার পরই বার্দ্ধক্যপীড়িত তার দেহ শয্যা নিল।

শ্বশুরের সেবায় যমুনার দিন আর রাতে কোন ভেদ রইল না! রোগ শিশুর মতো জেদী, বুঝিয়ে সুজিয়ে কিছুক্ষণের জন্য কোন রকমে তাকে বশে আনা যেতে পারে, কিন্তু মৃত্যু এত ভুলো নয় যে কথার মোহে মাঝ পথে থমকে দাঁড়িয়ে থাকবে! একদিন বৃন্দাবনের বাবার অন্তিম সময় নিকটে এসে পড়ল।

নাভিশ্বাস নিতে নিতে সে যমুনাকে বললে—বাছা, আমার কপালে তোর হাত একটু রাখ...আঃ! কত ভাল লাগল। বৃন্দার হাতের শীতল স্পর্শের মতই তোর হাতের স্পর্শ। সে আসে নি, নাইবা এল, তুই আমার পুত্র। তুই আর সে অভিন্ন। না, না, না বাছা ব্যাকুল হ'সনা। আমি এখনো সজ্ঞানে আছি। এখন আমার দুঃখ বেদনা সব দূর হয়ে যাচ্ছে, আর বেশি দেরি নেই, কাঁদিস না। এমন সময় কেঁদে কি আমায় দুঃখী করবি? আমার তো ডাক এসেছে। ছেলেটাকে দেখিস, তোর পুণ্য তোকে সুখী রাখুক।

ছোট শিশু নিয়ে সেদিন রাত্রিতে যমুনা বাড়ীতে একাই রইল। সে চারিদিক অন্ধকার দেখল, শুধু অন্ধকারই। কেমন করে সে ঐ বাড়ীতে নিরাশ্রয় হয়ে থাকবে? তার মনে হল যেন তার সব বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। এটা ওর পক্ষে একটা মারাত্মক আঘাত। তবু শিশুর মুখ চেয়ে সে নিজেকে সামলে নিল। আঘাত প্রথমে খুবই লাগে, প্রহার শেষ হয়ে গেলে তার তীব্রতা ততটা আর অনুভব হয় না। তখন মলমের ছোট্ট পটি দিয়ে সেই ক্ষত ঢেকে রাখা যায়। যমুনা এই ভাবেই নিজের ব্যাথাকে সামলে নিল।

কিছু প্রকৃতিস্থ হয়েই সে বুঝতে পারল তার বাড়ীর সব কিছু তার নিজের নয়। তার উপরে ঋণের একটা মস্ত বড় বোঝা আছে। নবাগত শিশুর মতই বিশেষ আনন্দ ও উৎসবের মধ্য দিয়ে ঐ বাড়ীতে প্রথমে এই ঋণের আগমন হয়েছিল। নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বড় হবার পর শিশুদের বড় হওয়া থেমে যায়। কিন্তু ঋণের বৃদ্ধি আটকাতে পারে এমন বন্ধন কোথায়? সেটা বেড়েই চলে, ক্রমাগত বেড়ে চলে, এমন কি ঘরের চালা আর দেওয়ালও তার উর্ধ্বগতি আটকাতে পারে না। ঋণের এই স্বরূপ যমুনার জানা না থাকলেও, তবু তার পক্ষে এই ঋণ বেশিই ছিল। বন্ধক-দেওয়া কূপ আর ক্ষেত দায়মুক্ত করতে না পারলেও, কিছু গরু বাছুর বেচে, যমুনা অন্যান্য ঋণ শোধ করে ফেলল।

সে ঘটনাও আজ অনেক দিনের কথা। হল্লী বড় হয়ে এখন স্কুলে যায়। তার থলের মধ্যে বইয়ের গাদা দেখে যমুনা অনুমান করে যে ছেলেটা কিছু বিদ্যা শিখেছে। তার ধ্রুব বিশ্বাস এমন দিন আসবে যে-দিন হল্লী যমুনার স্বামীর চিঠি এলে সেটা যমুনাকে পড়ে শোনাতে পারবে।

ইতিমধ্যে যমুনার সামনে অনেক প্রলোভন এসেছিল। সে যদি ইচ্ছে করত তা হলে উচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া গেরস্থালি আবার কবে নূতন করে গুছিয়ে নিতে পারত। তার সমাজের দিক থেকে এ-বিষয়ে কোন নিষেধ ছিল না। এর জন্য শুধু একবার জাতি-ভোজের ব্যবস্থা করলেই যথেষ্ট হত। এটা করাও তার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন ছিল না, তবু সে এদিকে মন দেয়নি। মানুষের স্বভাব বড়ই বিচিত্র। যেখানে দুঃখ নাই সেখানে তা সৃষ্টি করে এবং তাকে সহজ সরল করে নিতে চায়। এমনি তার প্রকৃতি, এই কারণেই সে অন্ধকারের আয়োজন করে নিজের সুখ-নিদ্রার জন্য। যমুনা স্বামীর স্মৃতি ভুলতে চায়। সেটা তাকে বড়ই বেদনা দেয়। তাই ঐ সময় সে নিজের শ্বশুরের কথা চিন্তা করে। পতির প্রতি অভিমান করার অধিকার তার আছে। শ্বশুরের বিষয় কেন চিন্তা করবে না? তাঁর কথা সে চিন্তা করে এবং একাকী ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে চিন্তা করে—তিনি আমাকে পুত্র বলে সম্বোধন করতেন। মরবার সময়েও তিনি আমাকে একথা বলেন নি যে, আমি এই বাড়ীতেই যেন থাকি। তিনি আশীর্বাদ করে গেছেন—আমার পুণ্য আমাকে সুখে রাখুক। আমার তো কোন

পুণ্যই নেই। পুণ্য যদি থাকত তাহলে এত দুর্ভোগ কেন ভুগতে হচ্ছে। তাঁরি পুণ্য আমাকে সৌভাগ্যবতী নারী হিসেবেই বাঁচিয়ে রাখবে। তিনি দেবতুল্য ছিলেন। তাঁর কথা অসত্য হতে পারে না।

বাহ্যত দেখলে মনে হয় না যমুনার কোন অভাব আছে। সে খায়দায়, ঘরের কাজকর্ম্ম করে এবং সম্ভবত ভাল ভাবেই ঘুমায়ও। দেহ তার দুর্বল নয়, হল্লীকে নিয়ে সর্ব প্রকারে সে নিজের মনকে পূর্ণ করে রাখতে চায়।

তবু মনে হয় তার মনের মধ্যে কিছু রিক্ততা আছে। তার এই রিক্ততাকে কোন বদ্ধমূল কঠিন ব্যাধিও বলা যেতে পারে। এই ব্যাধি-গ্রস্ত রোগী কখনো কখনো এমনও ভেবে নেয় যে সে নীরোগ। কিন্তু স্বচ্ছ আকাশেও কোন দিন হঠাৎ কোত্থেকে উল্টো হাওয়া আসে, ফলে চাপা ব্যাধির প্রকোপ আর চাপা থাকে না। যমুনার ক্ষেত্রেও সেদিন এমনই ঘটেছিল। পিওন তার বাড়ী পর্যন্ত এল, এসে কিছু দিয়েও গেল, তবু তার পতির চিঠি পেলনা। যেন ভাগ্য ঐ ক্ষুধিত তৃষিতের কাছে একটি সুন্দর সুস্বাদু ফল এগিয়ে দিয়েছিল, সেটা সে নেবার জন্য এগিয়েও গিয়েছিল, কিন্তু নির্দয় ভাগ্য সেই ফল তাকে না দিয়ে নিজেই খেয়ে ফেলল।

রাত্রিতে মায়ের খাটের পাশা-পাশি নিজের খাটে শুয়ে হল্লী আবার সেই প্রশ্ন তুলল, বলল—

আমার পঞ্জিকায় সুন্দর সুন্দর বস্তুর সূচীপত্র দেখে স্কুলের ছেলেরা অবাক হয়ে গেছে। চমৎকার ছবিগুলি। ছেলেরা নিজেদের থলে ভারী করার জন্যে গলি-পথের থেকে কাগজ কুড়িয়ে নেয়। সেগুলো বিশ্রী নোংরা, তবুও আমাকে বলে—তাদের থলে আমার থলের চেয়ে বড়। কারও কাছে এমন পঞ্জিকা নেই। সকলেই আমার উপর বিরক্ত। কিন্তু আমি কাউকে কি ভয় করি! হুঁঃ ছেলেরা এমন খারাপ যে কারও ভাল জিনিষ দেখতে পারে না।

যমুনাকে ছেলের এই রকমের আলোচনা-প্রত্যালোচনায় রোজ অংশ নিতে হত। হল্লী দেখল তার কথায় মা কান দিচ্ছে না, তবু সে বলেই চলল—

শুনেছ মা, হীরার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ভেঙে গেছে।

যমুনা বলল, কারো সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করা ভাল নয়। হীরালাল তো ভাল ছেলে।

যমুনার মহাজন মতিলালের পুত্র হীরালাল। কখনো কখনো তার সঙ্গে হল্লীর ঝগড়া হয়। সে বলল—

চুলোয় যাক ভাল ছেলে! যদি ভাল ছেলেই হবে তবে কেন সে মিথ্যে কথা বলে? বলে, এমন পঞ্জিকা তার বাড়ীতে গাদা-গাদা আছে। গাদা-গাদাই যদি থাকবে, তবে থলের মধ্যে কেন রাখে না, আমার কাছে একটা ভাল এসে পড়েছে তাই বার বার বলে আমাকে দেখতে দাও, আমাকে দেখতে দাও। আমি বললাম, তুমি ছিঁড়ে-খুঁড়ে আজই পুরনো করে ফেলবে, আমি দেখাব না। বাস, এর জন্যই বন্ধুত্ব ভেঙে গেল। বন্ধুত্ব ভেঙে গেল, বয়ে গেল। আমার আরও অনেক বন্ধু আছে।

হল্লী দেখল মা এখনো নীরব। সে আবার বলল, এবার আমি কলকাতা থেকে অন্য পঞ্জিকা আনাব। সেটা আরও সুন্দর।

সে জানত কলকাতার কথা বললে মা সন্তুষ্ট হবেন। তার অনুমান সত্য হল। স্নেহময় স্বরে যমুনা জিজ্ঞেস করল, তুই আনাতে পারবি?

হল্লী উৎসাহিত হয়ে বলল, নিশ্চয়ই, কেন পারব না। আমাদের স্কুলের ম্যাপেও কলকাতা লেখা আছে। কলকাতায় অনেক ধান হয়। আচ্ছা, আমার একটি প্রশ্নের জবাব দাও দেখি। বল তো পাঞ্জাবে কি হয়?

যমুনা হেসে বলল, আমি কি জানি।

হল্লী বলল, হ্যা, তুমি বলতে পারবে না জানি। খুব কঠিন প্রশ্ন। হীরা উত্তর দিতে পারেনি। আমি ঠিক উত্তর দিয়েছিলাম। বড় মানুষের ছেলে, ঘুরে বেড়ায়, লেখা-পড়া কিছু করে না। এই জন্য পণ্ডিত-মশায় আজ তাকে পিটিয়েছিলেন। যমুনা বললে, তুই প্রথমেই কেন তাকে বলে দিসনি? তুই বলে দিলে ও মার খেত না। আর এই পণ্ডিতমশায়ই বা কেমন, এমন কঠিন প্রশ্ন করে ছেলেদের পিটুনি দেন।

হল্লী বলল, না মা, তুমি জাননা। পিটুনি না খেলে কারও কি

বিয়ে হয়। পণ্ডিতমশায় গুরুজন, মা-বাবার চেয়েও বড়। উনি পিটুনি দেন তাই ছেলেরা লেখাপড়া করে।

যমুনা বলল, অন্য কারও ক্ষুদে ছেলেদের গায়ে আমি তো হাত তুলতে পারি না।

তুমি বড্ড ভাল মানুষ। আচ্ছা মা, বাবারও স্বভাব কি এই রকমই ছিল? আমি তাঁকে দেখিনি। বড় হয়ে তাঁকে দেখতে যাব কলকাতায়।

যমুনা বলল, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাস। তুইও আমাকে এই খানেই ছেড়ে চলে যাবি না তো?

হল্লী গম্ভীর হয়ে বলল, আমি তোমাকে নিয়ে যেতে তো পারি সেখানে, কিন্তু সেখানে মেয়েদের কোন কাজ নেই, বেজায় ভিড় সেখানে। ঐ ভিড়ে তুমি কোথাও লোকের পায়ের তলায় পড়ে চ্যাপটা হয়ে না যাও। বাবাকে দেখা-মাত্র আমি নিজেই চিনে নিতে পারব যে উনি-ই বাবা।

যমুনা জিজ্ঞেস করল, কেমন করে চিনবি?

কেন চিনতে পারব না। সহজ ব্যাপার। সকলেই তো বলে আমার চেহারা ঠিক তাঁরই মত। ভাল হত যদি আমার চেহারা তোমার মতন হত। তোমাকে আমার খুব সুন্দর লাগে।

যমুনা ধমক দিয়ে বলল, বেশ, বেশ, এখন ঘুমোবি কিনা বল? ঘুমো, অনেক দেরি হয়ে গেছে। নিজেও ঘুমোবি না—আমাকেও ঘুমোতে দিবি না।

হল্লী মুখ ঢেকে চুপ করে শুয়ে রইল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর বলে উঠল, মা তুমি হীরার সম্বন্ধে একটা কথা শুনেছ?

যমুনা কোনো উত্তর দিলনা। কিছুক্ষণ পর হল্লী ঘুমিয়ে পড়ল।

[৩]

যমুনার ঘুম ছিল উপদ্রুত। তার মনে কত চিন্তাই আসে। যতই সেগুলিকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে ততই তারা আরো বেশি করে পেয়ে বসে।

ঘরের প্রদীপ প্রতিদিনের মতই নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে

কোন বস্তুই দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন বন্ধ ঘরের ছাঁচের মধ্যে পড়ে অন্ধকার জমাট হয়ে আছে। পিণ্ডাকার হয়ে আছে।

পাশে ঘুমন্ত হল্লীর নাক-ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে—আর সব দিকই নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে কোথাও হতে কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে, যেন ঐ সময়ে ঐ ডাক নিস্তব্ধতারই কোন স্বর।

এই সময়টা যমুনার জেগে থাকার পক্ষে সুবিধাজনক। এ সময়ে কেউ এসে চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে দিতে পারে না। বহু বছর ধরেই সে যে একাই আছে, এই সত্য ভাল করে বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে এমনি সময়।

এপাশ-ওপাশ করতে করতে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল তা টের পায়নি। ঘুমিয়ে পড়েছে বটে, তবু তার মনে হচ্ছে—সে দেখছে, ঘুরছে-ফিরছে, হাঁটছে।

দেখছে সে কোন অপরিচিত জায়গায় গিয়ে পড়েছে। চারিদিকে ধানের সবুজ ক্ষেতের ঢেউ। হল্লী বলেছিল কলকাতায় অনেক ধান হয়। ধানের ক্ষেত তো আছে কিন্তু এখানে কোথাও কোন মানুষ নাই। যত দূরে দৃষ্টি যায় তত দূরে শুধু সবুজ আর সবুজ। এই অবস্থায় একলা সে কোথায় যাবে? বহু দূরেও কোন মানুষের চিহ্নও নজরে পড়ছে না।

সহসা কিছু দূরে সে একটা ভেড়া দেখতে পেল। কিংবদন্তী আছে যে এক শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা পুরুষকে ভেড়া বানিয়ে রাখে। সে ভীত হয়ে উঠল। ভেড়াটা ঘাড় বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে যেতে যেতে, যমুনার দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে আর তাড়াতাড়ি চলেও যাচ্ছে। ঐ জীবের মধ্যে এমনি কিছু আকর্ষণ ছিল যে যমুনা তাকে অনুসরণ না-করে পারল না।

যমুনা চলেছে তো চলেইছে। তার পা ব্যথা করছে, তবুও দাঁড়াতে পারছে না। গাড়ীর পেছনে দড়ি দিয়ে বাঁধা কোনো সদ্য-কাটা গাছের ডালের মত যেন সে আপনা-আপনিই ঘেঁষটে ঘেঁষটে যাচ্ছে। এপাশের ওপাশের ঝোঁপ-ঝাড়ে জড়িয়ে গিয়ে তার কাপড় কখন ছিঁড়ে যাচ্ছে, দেহে কখন খোঁচা লাগছে—এ সব বুঝবার শক্তি তার নাই।

যেমনি একবার তার দৃষ্টি ভেড়ার উপর থেকে ক্ষণেকের জন্য সরে গেল অমনি ভেড়াটিও অদৃশ্য হয়ে গেল। চারিদিক আবার আগের মত

ফাঁকা। এই নির্জনতা হতে সে কেমন করে নিজেকে মুক্ত করবে? এখন আর ধানের সবুজ ক্ষেতও নাই। ভয়ঙ্কর বন এখানে। গল্পের কদলী বন। এই বনের কোন দিক-দিশা পাওয়া যাচ্ছে না। নিজেকে নিঃসহায় মনে করে এক জায়গায় বসে কাঁদতে লাগল, হায়! এই ভেড়াও তার স্বামীর মতই নির্দয়।

কিছুক্ষণ কাঁদবার পর সে চোখ-তোলামাত্র সামনে অনেক দূরে ছায়ার মতন দু'জন মানুষ দেখতে পেল। না, দুজনই পুরুষ নয়। এক জন পুরুষ অন্যটি স্ত্রীলোক। সে আবার উঠে হাঁটতে লাগল।

এবার সে স্পষ্ট দেখলে—আরে, এ যে তার স্বামী। মনে মনেই প্রশ্ন করলে, সঙ্গের ঐ স্ত্রীলোকটি তবে কে?

অপরদিকে ঐ স্ত্রীলোকটিও যমুনার দিকে আঙুল তুলে বললে, একেই সঙ্গে করে আনছিলে? এ কে?

যমুনা স্তম্ভিত হয়ে রইল। যেন তার বুকে কেউ পাথর চাপিয়ে দিয়েছে। সে চীৎকার করে উঠতে চাইছে, কিন্তু তার জিভ নড়ছে না।

ওদিকে বৃন্দাবন ঐ স্ত্রীলোকটির প্রশ্নের উত্তরে বলল, গাঁয়ের সেই নারী যার বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল।

হায় রাম! গাঁয়ের একটি নারী, সেই যার সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল! যমুনা জোরে জোরে নিজের কপাল চাপড়াতে লাগল।

তাই দেখে ঐ স্ত্রীলোকটি হাততালি দিয়ে হাসল। বলল, তোমার গাঁয়ের এই স্ত্রীলোকটি তো বেশ!

বৃন্দাবনও সেই সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে হাসতে লাগল।

যমুনার সর্বাঙ্গে যেন আগুন ধরে গেল। এরই পাল্লায় পড়ে আছেন! এর সঙ্গে কেমন মিলেমিশে হাসছেন। আমার সঙ্গে কথাও বলছেন না। ছিঃ, ছিঃ, স্ত্রীলোকটি কী ওঁছা! রূপে রঙেও ভাল নয়, না ভাল কথাবার্তায়। ভাল রঙীন কাপড় পরেছে আর ভাবছে আমার মতন আর কেউ নেই।

যমুনা চট করে তার নিকটবর্তী হওয়া-মাত্র সেই স্ত্রীলোকটিও চেহারা বদলে ফেললে—ওরে মা, এর তো বড় বড় দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। এযে মানুষ-খেকো ডাইনী!

যমুনা খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুমও ভেঙে গেল।

মা, কি হয়েছে, কি হয়েছে ?—বলে হল্লী নিজের খাটে উঠে বসল।

পাখীরা কলরব শুরু করেছে, তখনো কিছু অন্ধকার ছিল। মনে হচ্ছিল যেন প্রভাতকে স্বাগত জানাবার জন্য কোন আলৌকিক ধূপদানি থেকে একটা সুবাসিত ধোঁয়া চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

ছেলে জেগে উঠেছে দেখে যমুনা লজ্জিত হল। বলল, ভয় করিস না হল্লী, আমি স্বপ্ন দেখছিলাম।

হল্লী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, স্বপ্নই যদি দেখছিলে তবে এমন করে চেঁচিয়ে উঠলে কেন ?

স্বপ্ন এই রকমই ছিল।

ভোরের স্বপ্ন সত্য হয়। কেন সত্য হয় মা ? আমি কখনো এমন স্বপ্ন দেখতে পাইনা।

কেন নিজে স্বপ্ন দেখেনা এই চিন্তায় হল্লী ভুলেই গেল মায়ের স্বপ্নের ঘটনা জিজ্ঞেস করতে। যমুনা বিমর্ষভাবে বিছানা গুটিয়ে খাটে তুলতে লাগল।

[৪]

ভোরের স্বপ্ন সত্য হয় এই চিন্তা সারা দিন যমুনার বুকে বর্শার মতো বিঁধতে লাগল। কেমন দুর্ভাগ্য যে তার জন্য স্বপ্নও স্বপ্নমাত্র হয়ে থাকতে চায় না। তার পতির বিষয়ে চারিদিকে যে-সব কথা শোনা যাচ্ছে, তার সঙ্গে এই স্বপ্ন খুব মিলে যাচ্ছে। যমুনার নিজের মনেও যে এই ধরনের কথা জাগেনা তাই বা সে কেমন করে বলবে। সারাক্ষণ তার মনে এই চিন্তাই তোলপাড় করছে—আর সে ভাবছে বাইরের আলোচনায় সে কান দেবে না, পতির নিন্দা কানে শুনবে না, মনে ভাববে না। কিন্তু আজকের স্বপ্নের বিষয় সে কি করবে ? সে নিজের চোখে সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখেছে, তার মুখের কথাও শুনেছে। সে মনে মনেই বলে উঠল—হে জগদীশ প্রভু, আমার প্রথম দুঃখ কি কিছু কম ছিল ! এই সব দেখাবার আর শোনাবার আগেই যদি আমাকে অন্ধ আর কালা করে দিতে সেটা কত ভাল হত !

তার মনে ধিক্কার হল এই ভেবে, এখন তো এই সব কথা ভাবছি, আর তখন তার ভয়ঙ্কর রূপ দেখেই এমন করে চেঁচিয়ে উঠলাম যে হল্লী জেগে উঠল। আমাকে খেয়ে ফেললেই বা মন্দ কি হত। তার সঙ্গে আমি দুটো কথাও তো বলতে পারতাম। স্ত্রী জাতি—কতই আর কঠোর হত। কিন্তু আমার এত পুণ্য নেই তাই এত ভয় হয়েছিল। যার পুণ্য আছে সে যমরাজের হাত থেকেও আপন ধন ফিরিয়ে আনে।

দুপুরে হল্লী যখন স্কুল থেকে ফিরে এল যমুনা তাকে বলল, বাছা, আজ সন্ধ্যায় রামায়ণ পড়ে শোনাস।

সে স্থির করেছিল খুব মন দিয়ে রামায়ণ শুনবে। অর্থ যদি নাও বুঝতে পারে তবুও তাতে ক্ষতি নেই।

রামায়ণ পড়ে মাকে শুনিয়ে নিজের বিদ্যা দেখাবার উৎসাহ হল্লীর কাছে পুরনো হয়ে গেছে। সে বলল, পুঁথিটা আর ভাল নেই। তার মলাট আলগা হয়ে গেছে। প্রতিটি পাতা আলাদা হয়ে গেছে। ওটা পড়তে ইচ্ছে করেনা।

কত ভাল পুঁথি, আর তুই বলছিস পড়তে ইচ্ছে করেনা! এমন বড় অক্ষরের পুঁথি আর কোথাও পাওয়া যায় না। পাঁচ টাকা বাঁধাতেই খরচ হয়েছে।

পাঁচ টাকা! আমি তো দুই টাকায় সোনার রঙের সুন্দর মলাটের রামায়ণ আনতে পারি, নিচে অর্থও লেখা আছে। রামু দোকানীর কাছে আজই এসেছে, এমন নূতন যে তুমি দেখে অবাক হয়ে যাবে। টাকা দেবে মা?

হল্লী ভাবতে পারেনি যে মা টাকা দেবে। প্রসন্ন হয়ে সে বলল, হ্যাঁ শোনাব, দাও টাকা।

যমুনা টাকা দিয়ে দিল। সে ভাবল রামায়ণের পুঁথির জন্য দুই টাকা এমন কি? বলল, দেখিস যেন পড়ে না যায়। দেখে নিস পাতা যেন ছেঁড়া না থাকে।

দরদস্তুর করার কথা তার মনে আসেনি। রামায়ণের জন্য দরকষাকষি করা অনুচিত।

হল্লী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল।

হল্লীর প্রসন্নতা দেখে যমুনার চোখে জল এল। মনে মনেই সে বলল, ও রামায়ণের পুঁথির জন্য কেমন খুশী হচ্ছে। ভগবান মহাবীর যেন ভাল কাজের জন্যও ওকে এই রকমই প্রসন্ন রাখে।

যমুনা এই বলে নিজের দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল।

একা ঘরে তার মন আবার আনচান করে উঠল। কাজ-কর্ম কোন রকমে সেরে সে ক্ষেতের দিকে বেরিয়ে পড়ল। গ্রামের বাইরে ঐ জায়গাটি খুব সুন্দর। চারিদিকে গম আর ছোলার সবুজ ক্ষেত। তিসির আর সরষের নীল-পীত ফুলগুলি স্থানে স্থানে এই শ্যামলিমায় সুন্দর সুন্দর বেলবুটির কাজ করেছে। যখন বাতাস ঝাপটা মেরে চলে যায় তখন মনে হয় যেন এই শ্যামলিমাও তার পিছনে পিছনে কিছু দূর পর্যন্ত চলে যাবে। এই শান্ত পরিবেশে যমুনার মন আরও উদাস হয়ে গেল। সে ঐ অচল শ্যামলিমার মতই কোন দূরগামী, অত্যন্ত দূরগামীর পিছনে পিছনে যেতে চায়, যেখানকার সেই খানেই সে পড়ে থাকে, তবুও তার মন যেন স্থির থাকতে পারে না।

ক্ষেতের কাজ অন্যের সঙ্গে ভাগে হচ্ছিল, সেখানে তার বিশেষ কিছু করবার ছিল না, যতটুকু ছিল তাতেও মন দিতে পারল না।

সন্ধ্যা হয়ে এল। গরু-মেষ আর উলঙ্গ ছেলেপিলেদের দল চলেছে আগে আগে আর তাদের পিছনে পিছনে কাঁধে ভুসির বোঝা নিয়ে ক্ষেত-ফেরতা স্ত্রীলোকেরা নিজের নিজের বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। চারিদিকের নির্জনতা আরো বেড়ে গেছে। তবুও যমুনা নিজের বাঁধান কুয়ার উপরে একাই চুপ করে বসে আছে।

কুয়ার পাশেই সবুজ পাতায় ছাওয়া সুডোল কলসীর মতো ঝোপাল একটি সুন্দর আমের গাছ আছে। এখনো এই গাছে ফল ধরেনি। গত বছর কেবল মুকুল ধরেছিল। এই গাছের পিছন থেকে বেরিয়ে তৃতীয়া চতুর্থীর চাঁদের কিরণ-রশ্মি যমুনার মুখে এসে পড়তেই হঠাৎ তার কিছু মনে পড়ে গেল।

সে গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াল। এই গাছের সঙ্গে তার খুব মধুর একটি স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এই কথা মনে পড়তেই তার চোখের জল গণ্ড বেয়ে টপ-টপ করে পড়তে লাগল। এই চোখের জলকে সে অনেকক্ষণ ধরে সম্বরণ করে রেখেছিল। চোখের জলও সময়-অসময়ের

কথা জানে, এই জন্যই ইতিপূর্ব পর্যন্ত থেমে ছিল। এখন এই একান্তে আর কেমন করে থেমে থাকবে? এখানে কারও জন্য ভয় নেই, নেই লজ্জা, এখন তো চোখের জল ঝরবেই ঝরবে।

সে ভেবে দেখল, আজ বুধবার? হ্যাঁ, সে-দিন এই দিনই ছিল। সময়ও ছিল এমনি, আর এই রকমই ছিল জ্যোৎস্না। চারিদিক এই রকমই নির্জন ছিল, স্থানও ছিল এই-ই। যা কিছু ছিল অতিরিক্ত, তা এখন আর নেই। তখন তার শ্বশুর-শাশুড়ী দুজনেই বেঁচে ছিলেন। তার স্বামী কেমন করে কি জানি এমন একটী কৌশল খাটিয়ে ছিল, যার জন্য কেবলমাত্র সে আর যমুনা এই স্থানে মিলিত হতে পেরেছিল।

বৃন্দাবন বলল, চল এই সময় ঐ আমের আঁঠি পুতেঁ দি।

সামনেই কিছু দূরে যমুনা ছিল, সেখান থেকে তাকে জোর করে বৃন্দাবন টেনে আনল কাছে। লজ্জায় সংকুচিত হয়ে যমুনা বলতে লাগল, কি করছ, কেউ দেখে ফেলবে যে!

চারিদিক নির্জন দেখে কিছুক্ষণ পরে যমুনার সংকোচ কেটে গেল। বৃন্দাবন খুরপি দিয়ে গর্ত খুঁড়তে লাগল আর সেই গর্তে জল ঢেলে দেবার জন্য যমুনা কলসী নিয়ে কুয়া থেকে জল তুলতে লাগল।

এই নির্জন একান্তে আছে কেবল সে আর তার পতি। তৃতীয় আর কোন ব্যক্তি নেই। ঘর-বাড়ী এবং সংসার চোখের আড়াল হয়ে গেছে। এখন সে আর সংকোচ করতে পারে না। বিবাহের পর এর আগে রুদ্ধ ঘরেই সে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছে। আজই এই প্রথম অবসর যখন এই অসীম আনন্দ অনুভব করলে সে। নিঃসংকোচে সে স্বামীর পাশে গিয়ে বসল।

সে কাছে এসে বসায় গর্ত খোঁড়ার কাজে বৃন্দাবন যে কিছু সহায়তা পেল তার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, বৃন্দাবনের হাতের কাজ শিথিল হয়ে গেল। খোঁড়া মাটি গর্তে না ফেলে একবার যমুনার গায়ে ফেলে দিল। যমুনাও তার আঁচলের প্রান্ত এমন করে ঝাড়ল যে ঐ মাটি বৃন্দাবনের উপরেই গিয়ে পড়ল। তবুও অভিমান করে সে তাকে দুষতে লাগল। বলল, এই রকম আনাড়ীর মতন কি কাজ করা হয়? দাও খুরপি দাও, আমি খুঁড়ব।

গর্ত খুঁড়ে আবার সেটা মাটি দিয়ে বুঁজিয়ে দেওয়া হল। এইবার আঁঠি পোঁতার পালা।

বৃন্দাবন বলল, তুমি পোঁত।

যমুনা বলল, না, আমি না, তুমি।

আঁঠি পোঁতার সমস্যা সাধারণ সমস্যা ছিল না। বৃন্দাবন বলল, এই আঁঠি খুব ভাল আমের। এর ফল আমি-তুমি অনেকদিন ধরে খাব। তুমিই এটা পুঁতে দাও। স্ত্রীর হাতে রসায়ন থাকে।

যমুনা বলল, রাম! রাম! কেউ কি স্ত্রীর হাতে পোঁতা গাছের ফল খায়?

বৃন্দাবনও তেমনি ভাবেই জবাব দিল, রাম! রাম! কেউ কি কখনো স্ত্রীর হাতে তৈরী রুটি খায়?

যমুনা হেসে বলল, না, সত্যিই আমার হাত কুলক্ষণে। আমার হাতে পোঁতা আঁঠি অঙ্কুরিত হবে না।

বৃন্দাবন তার চিবুক ধরে মুখটা উঁচু করে ধরল। চাঁদের ঝাপসা আলো তার মুখের উপরে পড়ে ফুলের মত ফুটে উঠল। চিবুক ধরেই তার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে সে বলল, দেবতার মুখ! কুলক্ষণার রূপ কি এমনী হয়, রাণী আমার?

স্থির হল দুজনে মিলেই আঁঠি পুঁতে দেবে; সেদিন দুজনে মিলেই আঁঠি পুঁতল।

যেদিন প্রথম যমুনা ঐ আঁঠিটি অঙ্কুরিত হয়েছে দেখল সেদিন তার আনন্দের সীমা ছিল না। তখন থেকেই হৃদয়ের ষোল আনা স্নেহ দিয়ে সে এই গাছটিকে পালন করেছে। ইতিমধ্যে তার সংসারে কতই ওলোট-পালট হয়ে গেছে। তবু এত দুঃখের মধ্যেও সে এই গাছের তত্ত্বাবধান করতে ভোলেনি। বৃন্দাবন তাকে কতবার বলেছিল—এই গাছের প্রথম ফল ঠাকুরের ভোগে দিয়ে তোকে দেব। এবার এই বছরেই এই গাছে ফল ধরবার কথা।

কিন্তু যিনি আমাকে তাঁর নিজের হাতে এর প্রথম ফল খেতে দেবেন, তিনি আজ কোথায়? আমাকে ভুলে গেছেন, ভুলে যান, নিজের দেওয়া কথা তো স্মরণ করুন। হায় তিনি কি করবেন, কারও ফাঁদে পড়েছেন। তা না হলে কি জেনে-বুঝেও আমাকে ভুলে যেতেন?

আঁঠি পোঁতার সেই ঘটনা এতদিন পরেও সেই প্রথম দিনের মতনই যমুনা চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। সকলের জীবনেই কোন-না কোন স্মৃতি এমন থাকে যা কখনো পুরান হয় না। কোন কবির চিরন্তন বাণীর মত তা বার বার বলা যেতে পারে; ভাষার পরিবর্তন হয়, হোক, সময়ও সেই রকম থাকে না, না থাকুক, কিন্তু তা যেমন ছিল তেমনিই থাকে, তার কোন পরিবর্তন ঘটে না। যমুনার কাছে এই স্মৃতি ওই রকমই। তাই এতে সে এতই তন্ময় হয়েছিল যে বাইরের অন্য সব কিছু ভুলে গিয়েছিল।

এখানে এই গাছের তলায় কে? আরে! এ যে যমুনা, এ সময় তুমি যে এখানে?

যমুনা সচেতন হয়ে দেখল, সামনের পাকদণ্ডী পথের উপরে অজিত দাঁড়িয়ে আছে। যমুনা লজ্জা বোধ করলে। বলল, বাড়ী ফিরছি। তুমি কোত্থেকে আসছ, মাতে?

অজিত বলল, ধনু কোরীর বাড়ী থেকে ফিরছি। যখন অন্যের দ্বারা কাজ উদ্ধার হয় না তখনই অজিত মাতের ডাক পড়ে। তার গৃহিণীকে ভুতে পেয়েছিল, ব্যাপার হয়েছিল খুব কঠিন। যত গুণী ছিল সকলেই হার মানলে, তখন ব্যস্ত হয়ে আমার কাছে দৌড়ে এল। কারও বিপদ ঘটলে তখন কাজ ফেলে যেতেই হয়। বেচারীর পরমায়ু ছিল বলতে হবে। আরও একদিন যদি দেরি হত তাহলে আমার আয়ত্বেরও বাইরে চলে যেত।

যমুনা ধীরে ধীরে অজিতের সঙ্গে হেঁটে চলল। সে জানে গ্রামে অজিতের মন্ত্র-বিদ্যার খুব মান-যশ আছে। স্বয়ং যমুনার এ বিষয় কোন আগ্রহ না থাকায়, সে স্বজাতীয় হলেও তার প্রতি এ-পর্যন্ত উদাসীন ছিল। কিন্তু আজকের দুর্ভাবনা এবং দুশ্চিন্তায় পড়ে যমুনা তার সহায়তা চাইল। বলল, আচ্ছা মাতে, ভোরের যে-স্বপ্ন, সে কি সব সত্য হয়?

হয়ও, আর হয়ওনা—অজিত বলল। আবার সে বলল, প্রথম এটা জানা দরকার কে স্বপ্ন দেখেছে, সেই স্বপ্নই বা কেমন। কি ব্যাপার?

যমুনা চুপ করে রইল। ভেবে পাচ্ছে না কি উত্তর দেবে। অজিত জিজ্ঞেস করল, বৃন্দাবন-ভাই সম্বন্ধে কি কোন স্বপ্ন দেখেছ?

চাঁদ নেমে এসেছে গাছগুলির পিছনে। তবু মাথা নিচু করেই যমুনা বলল, হ্যাঁ।

যার-তার কাছে পতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে তার সংকোচ বোধ হয়।

অজিত প্রসন্ন হয়ে বলল, আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। মুখ দেখলেই যদি মনের কথা না বুঝতে পারি তবে আর কি হল। আমার একটা পরামর্শ শোন। এখন তুমি অতীতের কথা ভুলে যাও। নূতন করে গৃহস্থালি পাতাও, তা হলেই আনন্দ পাবে। তুমি অনেকদিন পর্যন্ত বৃন্দাবনের জন্য নিরর্থক পথ চেয়ে আছ, এই যুগেও কেউ কি এতটা করে।

এ কথা যমুনার ভাল লাগল না। বলল, বহুদিন তো হল দিদি মারা গেছেন, তবু তুমি দ্বিতীয় বার কেন নিজের সংসার পাতলে না?

অজিত শুষ্ক হাসি হেসে বলল, আমার কথা স্বতন্ত্র। আমাকে মন্ত্র-তন্ত্র নিয়ে কাজ করতে হয়। এই কাজে প্রাণ হারাবার সম্ভাবনা থাকে—এবং—

যমুনা বলল, এবং আবার কি?

কারও কাছে দুঃখের কান্না কেঁদে কোন লাভ নেই বলে অজিত থামল। যমুনা চুপ করে আছে দেখে অজিত আবার নিজেই বলতে লাগল, আমার ভাগ্যে যদি থাকবার হত তা হলে গাঁঠের ধন কেনই বা হারাতাম। যার যাবার ছিল সে তো চলেই গেছে। তার স্মৃতিতেই সুখ পাই। লোকেরা বাইরে থেকে বিচার করে, তাই বলে—এ দুঃখী। কারও যদি কেবল দুঃখই থাকে তা হলে সে বাঁচে কেমন করে? যার বাড়ী ঝাঁড়-ফুক করতে যাই তার বাড়ীর জল খাওয়া তো দূরের কথা, তামাক খাওয়াও পাপ। দুপুর বেলায় উনুন ধরিয়েছিলাম মাত্র, তখনি এসে ধরে নিয়ে গেল। এখন বাড়ী ফিরে গিয়ে কি আর উনুন ধরাব। ভেবেছি আজ সম্পূর্ণরূপে উপোস করেই থাকব। এতেও আনন্দ আছে। একশ কথার একটি কথা এই—ঈশ্বর যা করেন তাই মেনে নেওয়া উচিত।

সহানুভূতিতে যমুনার হৃদয় ভরে উঠল। তারও মনের চিন্তা এমনই ছিল। তা প্রকাশ করবার মতন ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না। তার হৃদয়

উতলা হয়ে বার বার বলতে লাগল, আনন্দ এতেও আছে, আনন্দ এতেও আছে।

যমুনার ইচ্ছে হল অজিতকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে কিছু জল-যোগ করতে বলে, কিন্তু সংকোচ বশতঃ সে-কথা বলতে পারলে না।

হাঁটতে হাঁটতে তারা যে জায়গায় এসে পড়েছে সেখান থেকে দুজনের নিজের নিজের বাড়ী যাবার পথ ভিন্ন। অজিত বলল, তোমাকে আরও এগিয়ে দেব? ঐ দিক দিয়েই আমিও নিজের বাড়ী চলে যাব। তোমার দেরি হয়ে গেছে। এতক্ষণ পর্যন্ত গ্রামের বাইরে একা থাকা অনুচিত। কত রকমের মানুষের সঙ্গে দেখা হতে পারে।

যমুনা বলল, একাই চলে যাব। অপরিচিতের মত তো আর যাচ্ছি না।

অজিত বলল, কই স্বপ্নের কথা তো বললে না? কোন খারাপ স্বপ্ন ছিল? খারাপ স্বপ্নের ফল দান আর পুণ্য কর্মের দ্বারা সংশোধিত হতে পারে। আচ্ছা, এখন তবে চললাম।

অজিত চলে গেল। যমুনার মনে পড়ল যে বহুক্ষণ ধরে হল্লী একা আছে, আর হয়তো রামায়ণের পুঁথিও এনেছে।

দ্রুতগতিতে যমুনা বাড়ীর দিকে চলল।

[৫]

সেই পঞ্জিকা নিয়ে হল্লী আর হীরালালের মধ্যে বিরোধ বেড়ে চলল।

স্কুলের কথা। ছেলেরা এদিকে-ওদিকে অব্যবস্থিত ভাবে ছিল। কেউ কাঁচের টুকরা দিয়ে কাঠের পাটা ঘসছিল, কেউ দোয়াতে জল ঢাল-ছিল, কেউ বা নিজের দোয়াত কলমের খোঁজ করছিল। কোথাও বা দশজন, কোথাও বা পাঁচজন ছেলে দল বেঁধে হৈ-হৈ করে ঝগড়া করছিল। এমন সময় একটি ছেলে এসে খবর দিলে যে হেডপণ্ডিত মশায় আসছেন। সকল ছেলেদের মধ্যে বিদ্যুৎবেগে এই খবর পৌঁছে গেল। পণ্ডিতমশায় স্কুলে প্রবেশ করবার পূর্বেই ছেলেরা নিজের নিজের জায়গায় বসে জোরে জোরে বইয়ের পাঠ্য বিষয় পড়তে লাগল।

পণ্ডিতমশায় চেয়ারে বসে হাতের বেত দিয়ে সামনের টেবিলে ঠক্-ঠক্ শব্দ করতেই সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা নীরব হল। এইবার নিত্যকার রীতি অনুসারে পড়ান শুরু হতে যাচ্ছে এমন সময় হীরালাল উঠে বলল, পণ্ডিতমশায় এই হল্লী আমাকে খারাপ খারাপ কথা বলে।

হল্লী নিজের জায়গায় বসেই বলল, না পণ্ডিতমশায়, ওইই আমাকে বলেছিল, হল্লা, গল্লা, নির্বল্লা।

হীরালাল বলল, এ সব মিথ্যে কথা বলছে। ও আমাকে হিরুয়া-চিরুয়া বলেছিল।

পণ্ডিতমশায় টেবিলে হাতের বেত ঠুকে-ঠুকে দুজনকে এক সঙ্গে কথা বলতে বারণ করলেন। হীরালাল সামনেই ছিল, তাই কথা বলবার প্রথম সুযোগ সেইই পেল। সে বলল, পণ্ডিত মশায়, আপনি সেদিন ওষুধের যে-সব সূচীপত্র ছিঁড়ে ফেলেছিলেন, সেই রকম কাগজ হল্লী সঙ্গে এনেছে।

ঐসব কাগজ-সহ হল্লীর ডাক পড়ল। ভয়ে ভয়ে পণ্ডিতমশায়ের কাছে গিয়ে সে বলল, এটা সে রকম নয় পণ্ডিতমশায়।

হল্লীর হাত থেকে ঐ পঞ্জিকা কেড়ে নিয়ে পণ্ডিত মশায় নিচে ফেলে দিলেন এবং তার গালে দুই চড় বসিয়ে দিলেন। বললেন, দেশলাই দিয়ে পঞ্জিকা এখুনি পুড়িয়ে দাও।

কতকগুলি ছেলে দেশলাই আনবার জন্য এমনভাবে একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল যেন এখনি কোন বড় প্রতিযোগিতার খেলায় অংশ নিতে হবে।

হল্লী কাতর হয়ে কাঁদ-কাঁদ ভাবে বলল, পণ্ডিতমশায়, এর মধ্যে মহাদেবের রঙীন ছবি আছে।

পঞ্জিকায় মহাদেবের ছবি থাকার অপরাধে হল্লীকে আর একবার চড় মেরে পণ্ডিতমশায় বললেন, ফের যদি কখনো এমন জিনিস দেখি তাহলে পিটিয়ে ঠিক করে দেব।

হীরা ভাবল তার জিত হয়েছে, আর হল্লী ভাবল সে হেরেও হারেনি। তবুও তার মন কেমন যেন হয়ে গেল, সেদিন পড়ায় সে মোটেই মন দিতে পারেনি। সব অঙ্ক ভুল কষার জন্য আবার তাকে মার খেতে হল।

ছুটি হবার পর হল্লী হীরালালকে বলল, আজ তুমি আমাদের ওদিকে খেলতে এলে তোমার হাড় ভেঙে দেব।

এখনি নালিশ করছি, বলে পণ্ডিতমশায়ের কাছে যাবার জন্য হীরালাল এগিয়ে গেল। কিন্তু হল্লী আগেই দেখে ফেলেছিল যে পণ্ডিত-মশায় চলে গেছেন। ঘুরে এসে হীরালাল বললে, আমি যাব। দেখি কে বাধা দেয়। যদি গণ্ডগোল কর তাহলে ওয়ারেণ্ট জারি করিয়ে থানায় ভর্তি করিয়ে দেব।

বাড়ী গিয়ে হল্লী একটি ঘরের তাকে বই খাতার থলে ফেলে দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে খেলার মাঠে গিয়ে উপস্থিত হল। সে ভাবল, দেখি কেমন করে আজ হীরা আমাদের খেলায় যোগ দেয়। মনের উত্তেজনায় তার খেয়াল ছিল না যে রামুর দোকান থেকে ঐ সময় সেই রামায়ণের বই আনতে যেতে হবে। দুপুরে দোকানীর দেখা পায়নি, তাই স্থির করেছিল বিকেলে ছুটির পর আবার দোকানে যাবে।

মাঠে আগের থেকেই কতগুলি ছেলে উপস্থিত ছিল। একটি ছেলে ন্যাকড়া দিয়ে তৈরী বল আর কাঠের ব্যাট সঙ্গে এনেছিল। সে প্রস্তাব করল, একদফা ব্যাটবল খেলা হোক।

অন্য একদল কড়ি দিয়ে কি একটা খেলা খেলছিল। খেলায় যে-ছেলেটি হেরে গিয়েছিল, সে পা দিয়ে কড়িগুলোকে মট্ মট্ করে ভেঙে বলল, বল খেলায় কসরৎ হয়। যে জিতেছিল সে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, এমন সময় তৃতীয় ছেলেটি বলল, বাজিতে দান না রাখতে পারায় ন্যাড়া হারবার খেসারত দেবে।

যে-ছেলেটির সম্বন্ধে এই প্রস্তাব করা হল, সম্প্রতি তার মস্তক মুণ্ডন করা হয়েছে। তার ন্যাড়া মাথা দেখে সব ছেলে এক সঙ্গে খিল খিল করে হেসে উঠল।

আর একটি ছেলে বলল, এই রকম মাথায় চিলে ছোঁ মারলে খুব মজা হবে।

হল্লী এগিয়ে এসে বললে, এসব বাজে কথা, এস রেল-রেল খেলা করি। এই ন্যাড়া ছাদ না-থাকা কামরার কাজ দেবে।

এই নূতন প্রস্তাবে সব ছেলেরা পরম উৎসাহে সম্মত হল।

সাতটি কামরার গাড়ী তৈরী হবে—হল্লী বলল—কিন্তু কামরা হবে কে কে?

কামরা হবার জন্য সকলেই প্রস্তুত। এদের মধ্যে কামরা হবার জন্য বেছে নেওয়া হবে কোন কোন ছেলেকে, এই সমস্যা দেখা দিল। যাত্রীদের কামরা আমি হব বলে একটি ছেলে নিজের মাথায় পাগড়ির দিকে ইঙ্গিত করলে। ঐটাই যেন তার যাত্রী।

যাত্রীদের চারটি কামরা চটপট বেছে নেওয়া হল। ক্রমানুসারে প্রথম, দ্বিতীয়, ইণ্টার আর তৃতীয় শ্রেণীর। যে-ছেলেটি পরিষ্কার কাপড়-জামা পরেছিল তাকে করা হল প্রথম শ্রেণীর কামরা। অন্যদের কি করা যায়? মাল বহনের জন্য দুটি কামরাও ঠিক করা হল দুটি ছেলেকে, তাদের মাথায় পাগড়ি-টাগড়ি কিছু ছিলনা। আর এ-বিষয় চিন্তার কোন কারণই ছিলনা যে ন্যাড়া মাথার ছেলেটি থাকবে সকলের শেষে ছাদ-হীন গাড়ীর মতন।

হল্লী বলল, এই সাত জনের তো ব্যবস্থা হয়ে গেল, কিন্তু এখনও ইঞ্জিন তৈরী হয়নি, বিনা ইঞ্জিনে গাড়ী চলবে কেমন করে? বেশ, আমি স্টেশন মাষ্টার হব না, আমি হলাম ইঞ্জিন।

সকলে সার বেঁধে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ইঞ্জিন শিস দিল আর বলল, ঝক্‌-ঝক্‌-ঝক্‌!

ইঞ্জিন চালু হল কিন্তু গাড়ী একটুও নড়ল না। অগত্যা ইঞ্জিনকেই ধমক দিয়ে বলতে হল, গাড়ী কেন চলছেনা; কি খারাপ হয়েছে?

গাড়ী চলতে লাগল। একটু এগিয়ে গিয়ে ইঞ্জিন থেমে গেল। সে বলল, গাড়ী পিছিয়ে যাবে, লাইন ক্লিয়ার হয়নি এবং মাল-গাড়ীতে মাল তোলাও হয়নি। অর্জুন, তোর বল লখুকে দে, সে হচ্ছে পয়েণ্টস্‌ম্যান। গার্ডসাহেবকে বল দিলে তখন গাড়ী চলবে।

গাড়ী আবার ফিরে গেল সেইখানেই যেখান থেকে ছেড়েছিল। সেখানে যেন গাড়ীতে মাল তুলছে এইরকম ভাবে ছেলেরা কিছু করল। প্রথম শ্রেণীর কামরা গার্ড হয়ে বল নিল, দুই পাশে কিছু সংখ্যক ছেলে অল্প দূরে তারের খুঁটি হয়ে দাঁড়াল, তার পরই গাড়ী আবার চলল।

কিছুদূর গিয়েই ঝক্‌-ঝক্‌ শব্দ বন্ধ করে ইঞ্জিন আবার দাঁড়াল।

পেছনে ঘাড় বাঁকিয়ে সে বলল, ইঞ্জিন ছাড়াও অন্য কে ঝক্-ঝক্ করছে? রাধে, সোজা হয়ে থাক, গাড়ী যেন লাইন থেকে সরে না যায়।

আবার গাড়ী চলল—দৌড়ে চলল। রেল-লাইনের দুই পাশের তারের খুঁটি যারা হয়েছিল সেই সব ছেলেরাও সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হল্লা করে দৌড়ে চলল।

জব্বলপুর স্টেশন। গাড়ী পাঁচ মিনিট এখানে দাঁড়াবে, পাশের একটি ছেলে বলল। গাড়ী থামল। কিন্তু আধ মিনিটেই পাঁচ মিনিট হয়ে গেল। গাড়ী আবার চলল। জব্বলপুরের পর এল লক্ষ্মৌ, তারপর লাহোর। লাহোর থেকে ছেড়ে গাড়ী সোজা এসে দিল্লীতে দাঁড়াল। এখানে তাকে পুরা চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে হবে। এ পর্য্যন্ত সে অনেক লম্বা পথ পাড়ি দিয়েছে।

সহসা হল্লী বলল, দিল্লী নয়, এই স্টেশন কলকাতার।

হ্যাঁ, হ্যাঁ কলকাতারই—বলে উঠল সব ছেলেরা। তারপরই ফেরি-ওয়ালাদের হাঁক শোনা গেল, গরম-গরম ডাল রুটি বিস্কুট! কাশীর পেয়ারা।

হল্লী ইঞ্জিনের চালক হিসাবে হুকুম দিল, যার যা কেনবার দরকার, কিনে আনতে পারে। এখানে গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়াবে।

গাড়ী এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে পড়ল, যার যে দিকে ইচ্ছে ঘুরে বেড়াতে লাগল। হল্লী একা পড়ে ব্যথিত চিত্তে মনে মনেই বলতে লাগল, আমার তো কেনা-বেচার কিছুই নেই, আমি বাবাকে খুঁজব। বাপকে খুঁজবার কথা মনে হতেই তার চোখের সামনে বার বার তার মায়ের করুণ মূর্ত্তি ভেসে উঠতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে আবার সব ছেলেরা এক সঙ্গে জড়ো হতেই হল্লী লক্ষ্য করল হীরালালও সেখানে উপস্থিত রয়েছে। হল্লীর মন বিষণ্ণ হয়ে আসছিল, আবার তা সতেজ হয়ে উঠল। সে হীরালালকে বলল, খবর-দার। তুমি যদি আমার গাড়ীর কাছে আস!

সে বলল, কে যাচ্ছে! ছিঃ, ছিঃ, এমন করে কি রেলগাড়ী খেলা হয়? সাতজন্মেও পূর্ব-পুরুষরা রেলগাড়ী দেখে থাকলে তো—

তাকে মারবার জন্য হল্লী এগিয়ে গেল। কয়েকটি ছেলের মধ্যস্থতায় কোন রকমে ঝগড়া মিটে গেল।

গাড়ী আবার চলে সামনের কোন স্টেশনে গিয়ে দাঁড়াল। তখন একটি ছেলে বলে উঠল,—চা, গরম-গরম চা! গরম চা কিনবার জন্য হল্লী জামার পকেটে হাত দিয়েই জড় মূর্তির মতো যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে সে বিস্মিতভাবে বলল—আরে, আমার টাকা দুটো কোথায় গেল!

রেল গাড়ীর ছেলেরা সব ভিড় করে তার কাছে গিয়ে জড়ো হল। এক সঙ্গে অনেকের প্রশ্নের জবাব দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল।

হীরালালও ছেলেদের মধ্যে ছিল। সে জিজ্ঞেস করল, কেমন টাকা, কোত্থেকে পেয়েছিলে?

হল্লী উত্তেজিত হয়ে বলল, টাকা আবার কেমন, তোমার বাপের যে জিজ্ঞেস করতে এসেছ?

হীরালাল শান্তভাবে বলল, বিরক্ত কেন হচ্ছ? আমি তো এই ভেবে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তোমার মতন গরীব ছেলের কাছে কোত্থেকে টাকা আসতে পারে। যমুনা কাকীর কিংবা অন্য কারও চুরি করেছ। দুষ্টের শাস্তি ভগবান হাতে-হাতেই দেন। আমি এখনি গিয়ে কাকীকে বলছি।

এদের দুজনের কথা-কাটাকাটি শেষ হবার পর ছেলেরা এদিকে-ওদিকে টাকা খুঁজতে লাগল। হল্লী বলল, স্কুলে যখন ছিলাম তখনও টাকা পকেটে ছিল, পরে কি হল জানি না।

একটি ছেলে বলল, স্কুলেই তো কেউ লোপাট করে দেয়নি? ওখানে তোমার পকেটে ঝন্-ঝন শব্দ শুনেছিলাম একবার। এই হীরা খুব বদ, দেখেছিলে, কেমন হাসছিল।

হল্লী বলল, এখানে ভাল করে তো খুঁজে দেখ।

তার রেলগাড়ী দিল্লী, লাহোর আরও কত জায়গায় ঘুরেছে। ঐ সব জায়গায় টাকার খোঁজ করা সম্ভব ছিল না। যথাসাধ্য খোঁজা-খুঁজি করে বিষণ্ণ চিত্তে ছেলেরা নিজের নিজের বাড়ী ফিরে গেল। একটি ছেলে বলল, সরকারী তহবিলে রেল-টিকেটের বাবদ গেল দুই টাকা।

মাথা হেঁট করে হল্লী নিজের উঠোনের দরজার কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। উঠোনে সরাসরি মায়ের কাছে যাবার সাহস তার হল না।

যমুনা কিছুক্ষণ আগেই ক্ষেত থেকে বাড়ী ফিরেছিল। নিজের পাড়ায় ঢুকতেই হল্লীর টাকা হারিয়ে যাবার খবর সে পেয়েছিল। সে উঠানের দেয়ালের তাকে সন্ধ্যা-দীপ দিচ্ছিল। এমন সময় বাইরে হল্লীর পায়ের হাল্কা শব্দ শুনতে পেল। এই শব্দ তার চির-পরিচিত শব্দ। কোন অবস্থাতেই সে এই শব্দ ভুল শুনতে পারে না। ওখান থেকেই হল্লীর বিষণ্ণ চেহারা কল্পনা করে তার হৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠল। কোমল স্বরে সে বলল, কে, হল্লী?

কোন উত্তর না দিয়ে সে যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তখন যমুনা তার কাছে গিয়ে বলল, হল্লী, টাকা হারিয়ে গেছে কি?

এই প্রশ্নের স্বর তো বিরক্তির নয়। হল্লী কিছুক্ষণ আগে ভেবেছিল যদি মা বিরক্ত হন তা হলে সে রেগে বলবে, আমি কি ইচ্ছে করে ফেলে দিয়েছি, এতই যদি অসন্তুষ্ট হবে তাহলে টাকা দিয়েছিলে কেন। কিন্তু মায়ের স্বর বিরক্তিময় নয় বুঝতে পেরে সে বললে, মা—তারপর আর কিছু বলতে পারল না।

যমুনা বলল, হারিয়ে গেছে তো যাক, কিন্তু বাছা, টাকা পয়সা সামলে রাখতে হয়।

হল্লী হেঁট হতে চায়না, সে হীরালালকে বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছিল যে সে কারও পরোয়া করে না। কিন্তু মায়ের এই স্নেহের কাছে নত না হয়ে তো পারা যায় না। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

যমুনা দুই হাতে তাকে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে নিল। বলল, কাঁদিসনে বাছা, কাল তোর সঙ্গে পুঁথি আনতে আমিও যাব।

যমুনা মনে মনেই বলল, দু টাকা হারিয়ে গেছে তো যাক। জীবনে না জানি কত কি হারিয়ে যায়। এতেও আনন্দ, এতেও আনন্দ!

[৬]

সকালে স্কুলে যাবার সময় হল্লী বলল, আজ পড়তে যাবনা। কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, পণ্ডিতমশায় মারবেন।

নিজের পাঠ ভাল করে শিখলে পড়লে পণ্ডিতমশায় কেন মারবেন?

কাল টাকা হারিয়েছি, বলবেন, কেন হারালি।

চল, আমি সঙ্গে গিয়ে বলে আসব যেন না মারেন।

আজ যাবনা মা। তুমি সঙ্গে গেলে পণ্ডিতমশায় আরও রেগে যাবেন।

যমুনা বলল, তাহলে আজ এইখানে বসে লেখা-পড়া কর।

বাড়ীতে বসে লেখা-পড়া করতে হল্লীর কোন আপত্তি ছিলনা। কেন না সে জানে মা পড়তে বলবেন, কিন্তু পড়াবার বিদ্যা তাঁর কাছে নেই। বিদ্যা মানে পণ্ডিতমশায়ের হাতের ছড়ি। ছেলেরা বিদ্যার এই নাম-করণ করেছিল।

স্কুলে যাওয়ার থেকে ছুটি পেয়ে হল্লীর মনে হল যে সে দু টাকা দিয়ে আজকের দিনের ছুটি কিনেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই এই ছুটি তাকে পীড়া দিতে লাগল। স্কুলে না গেলে সে নিজের সঙ্গীদের কেমন করে জানাবে যে গত রাত্রিতে তাকে মায়ের কাছে মার খেতে হয়নি। সকলেই বলেছিল মা খুব মারবে। কেন মারবেন, আমি কি ইচ্ছা করে টাকা হারিয়েছি?

সঙ্গীদের এই সত্য খবরটা বলবার জন্য সে তৎক্ষণাৎ এই ছুটি ভোগ না করবার সংকল্প করে ফেলল। মাকে বলল, আগে আমাকে খেতে দাও, তার পর অন্য কিছু কর। স্কুলে যেতে দেরী হয়ে যাচ্ছে।

যমুনা বলল, এখনি যে বললি স্কুলে যাবনা।

হল্লী গম্ভীর হয়ে বলল, না গেলে কেমন করে চলবে? ভাল ছেলেরা স্কুল কামাই করতে চায় না। পরীক্ষা নেবার জন্য যে-কোন সময় ডেপুটি সাহেব আসতে পারেন।

নিজের ছেলে যে ভাল সে বিষয় যমুনার কোন সন্দেহ ছিল না। এক পাল গরুর সঙ্গে চরাতে নিয়ে যাবে বলে সে নিজের গরুর দড়ি খুলছিল, দড়ি-খোলার কাজ বন্ধ করে সে ছেলেকে খাবার দিতে চলল।

শিশুদের মাথা কোন তরল পদার্থে তৈরী, এই জন্যই জলের উপরে হাতের চাপড় মারার মতন আঘাতের মন্দ প্রতিক্রিয়া তাতে হয়না। শিশুদের মনের অবস্থাও কতকটা এই রকমেরই। কোন বেদনাদায়ক বিষয় তাদের মনে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। খাবার সময় হল্লীকে

দেখে বুঝতেই পারা যাচ্ছিল না যে গত কাল তার কিছু হারিয়েছে। সে জিজ্ঞেস করল, মা, হীরা তোমার কাছে এসেছিল?

কবে?

যখন আমার টাকা খোয়া গিয়েছিল। আসেনি?—বলেছিল—আমি এখনি গিয়ে কাকীকে বলে দিচ্ছি।

যমুনা বিরক্ত হয়ে বলল, আমার কাছে আসেনি। শীগ্‌গির খেয়ে নে, আমাকে গরু ছাড়তে যেতে হবে।

মায়ের এই কথায় কান না দিয়েই সে হীরার সম্বন্ধেই বলতে লাগল। বলল, এই হীরার বিষয় যদি শোন, তাহলে বুঝতে পারবে ও কেমন। যখন সে তোমার কাছে আসে তখন বাছা বাছা বলে তাকে কাছে বসিয়ে আদর কর। ওকে তো ভাল করে শায়েস্তা করা দরকার। কাল সে পণ্ডিতমশায়কে আমার উপরে চটিয়ে দিয়েছিল। এবার আমিও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করব। ছাড়ব না।

যমুনা বলল, সে মতিলাল চৌধুরীর ছেলে, তুই কেন ওর সঙ্গে ঝগড়া করিস? ওরা আমার কাছে অনেক টাকা পাবে।

হল্লী বলল, কে ঝগড়া করে, আমি? কখনো না। অর্জ্জুনকে জিজ্ঞেস করে দেখ। তাদের টাকা দিতে হয় দিয়ে দেব। সে যদি মেজাজ দেখায় তাহলে তাকে সোজা করে দেব। তুমি তাকে ভয় করে স্নেহ করনা, স্নেহ কর তোমার স্বভাবের দোষে।

যমুনা হেসে ফেলল। হল্লী বলতে লাগল, সে দিন যখন পঞ্জিকার পুঁথি এল, তুমি বলেছিলে এর দাম আমার কাছ থেকে নিয়ে পাঠিয়ে দিস। এই কথা আমি অর্জ্জুনকে বলেছিলাম, হীরা সেখানে এসে বলল, তুমি মূর্খ, আমি হলে মায়ের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে মেঠাই কিনে খেতাম আর মাকে বলতাম দাম পাঠিয়ে দিয়েছি। এই রকম শিক্ষাই সে দেয় আমাকে। বিশ্বাস কর মা, এ কোন দিন নিজের বাপের সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করে জেলে যাবে।

যমুনা বলল, তুই বসে খা, গরু খুলে দিয়ে আসি।

সে বলল, খেয়েছি, আর খিদে নেই।

যমুনা উঠতে যাচ্ছিল, আবার বসে পড়ল, বলল,—খিদে পাবে কেমন

করে, তোর বচন তো থামুক। নে, আমি বসছি, তুই ভাল করে খেয়ে নে। তিন প্রহর বাদে তো স্কুল থেকে ছুটি পাস, অতক্ষণ পর্য্যন্ত আমিও না খেয়ে থাকতে পারি না।

আত্ম-বিশ্বাসের জোরে হল্লী বলল, আমি জল-খাবার না খেয়েও তিন প্রহর পর্যন্ত থাকতে পারি। যদি বিশ্বাস না হয় বাজী রেখে দেখ। আমার ইচ্ছে করে আমিও তোমার মত স্নান না করে কিছু যেন না খাই।

যমুনা এর কোন প্রতিবাদ করা অনাবশ্যক ভেবে তাকে কিছু না জিজ্ঞেস করেই থালায় আরও কিছু খাবার দিল।

হল্লী হেসে বলল, আমি এখনো আরও একসের খেতে পারি। সে ভুলে গিয়েছিল যে অল্পক্ষণ আগেই বলেছিল যে তার খিদে নাই।

চুপ করে খেতে খেতে কিছুক্ষণ পরে সে বলল, মা, তুমি জান কেন আমার টাকা হারিয়ে গেছে, আমাকে ভগবানই এই শাস্তি দিয়েছেন। আমি বাবার পাঠ করা পুঁথির নিন্দে করেছিলাম। আমি নতুন পুঁথি কিনব না। পাঠের জন্য বাড়ির সেই পুঁথিই ভাল।

এর পরই সে গত কালকের খেলার প্রসঙ্গ তুলল। বলল, কাল আমি রেল-গাড়ীর খেলা খেলছিলাম। অন্য ছেলেরা বলেছিল এটা দিল্লীর ষ্টেশন। আমি বললাম—না, কলকাতার। অন্যেরা সকলে শখের জিনিষ কিনতে লাগল, আমি একা পড়ে যাওয়ায় বাবার কথা মনে হল। আমার মন কেমন-কেমন করে উঠল। বাবাকেও পেলাম না আর টাকাও হারিয়ে ফেললাম, কাল এমনি দশা হয়েছিল।

যমুনা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে সেখান থেকে উঠে চলে গেল। এ ছেলেটি এমন সব কথা বলে যে না কেঁদে পারা যায় না। তাকে বসবার জন্য হল্লীও কিছু বলল না।

[৭]

দু-তিন দিন পরের কথা। যমুনা বাড়ীর উঠানের দরজার দিকে পেছন ফিরে বসে কাজ করছিল। কারও পায়ের শব্দ শুনে সে চমকে চেয়ে দেখল অজিত। মাথায় শাড়ীর প্রান্ত কিছুটা টেনে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল।

অজিত জিজ্ঞেস করল, কি করছ ? যমুনা কোন উত্তর দিল না। যমুনার কাছ থেকে উত্তর পাবার কোন আবশ্যকতা ছিল তেমন কোন লক্ষণ অজিতের হাবে-ভাবে দেখা গেলনা।

বাড়ীর উঠানের দরজা পর্যন্ত অর্ধাংশে একটি উঁচু চাতাল ছিল, যার একটা দিক পতাকার দাঁড়ের মতন দরজা পর্য্যন্ত চলে গেছে। ভিতরে পেরিয়ে যাবার পথে ডান দিকে সেই চাতালের দেয়ালে একটি খোপ আছে, এর মধ্যে কোন সময় তামাকের সাজ-সরঞ্জাম এবং তার নিচেই আগুনের মালসা হয়তো থাকত। রোজ রোজ লেপা-পোঁছা হওয়ার দরুন পূর্ব স্মৃতির চিহ্নমাত্র ঐ জায়গার বুক হতে মুছে গেছে। ঐ খোপের কাছেই নিচে পা ঝুলিয়ে অজিত চাতালে বসে পড়ল।

সে বললে, আমি বাইরে গিয়েছিলাম, আজই ফিরেছি। শুনলাম হল্লী কিছু টাকা হারিয়ে ফেলেছে, এটা খুব খারাপ কথা। কেমন করে হারাল, কি ব্যাপার ?

যাকে-তাকে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে যমুনা বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। তবু শান্তভাবে বললে, ছেলেমানুষ; কেমন করে হারাল কি জানি ?

সে ছেলেমানুষ, কিন্তু এ ব্যাপারে তোমারও ছেলেমানুষি আছে। এমন শিশুদের হাতে কখনও টাকা দিতে আছে ?

যমুনা হেসে ফেলল। মৃদু বকুনির স্বরে অজিত বলল, তুমি হাসছ, এটা আরও খারাপ। ছেলেমানুষি নয় তো কি ? তুমিই বল, ভুল করলে তুমি আর মার খেল হল্লী। এ কেমন কথা ! আমি হলে ছেলেকে না মেরে তোমাকেই বকতাম। আমরা তো রাজা-নবাব নই যে এই রকম করে ছেলেদের হাতে টাকা দিয়ে টাকার শ্রাদ্ধ করব।

যমুনা গম্ভীর হল। অজিত যে-অধিকারের ভাষায় কথা বলছে তা যমুনার ভাল লাগল না। তবু এই সব কথায় এমন কিছু পেল না যা নিয়ে সে মনের ক্ষুব্ধ ভাব প্রকাশ করতে পারে। যেন কোন পাহাড়ী সরোবরের জল দূর থেকে দেখে তার প্রথমে তা মলিন এবং দূষিত মনে হয়েছিল কিন্তু সেই জল করপুটে নিয়ে তার মন তৃপ্ত হল, সে চুপ করে রইল।

অজিত ঐ প্রসঙ্গ ছেড়ে বলল, কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ী।

এমন পরিচ্ছন্নতা তো ঠাকুর-ব্রাহ্মণদের বাড়ীতেও দেখিনি। যখন মানুষের বিশেষ কোন কাজ-কর্ম থাকেনা, তখন কি আর করবে, গোবর দিয়ে লেপে-পুঁছেই সময় কাটায়। এখানে এসে মনে হচ্ছে যেন, দীপালী উৎসব আগতপ্রায়। যাই হোক, তবু এত বড় বাড়ী তোমার একার পক্ষে হয় তো ভুতের বাড়ীর মতো ঠেকছে। ঠেকছেনা কি?

যে-বাড়ীতে হল্লী বাস করে তাকে অজিত ভুতের বাড়ী মনে করে। যমুনা বহু চেষ্টা করেও নিজেকে সম্বরণ করতে পারল না। বলল, এই ভুতের বাড়ীকে অভিশাপ দিতে এসেছিলে?

যমুনার মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল, যেন কেউ সোনাকে আগুনের তাপে তরল করে দিয়েছে।

সোনা তপ্ত হোক আর ঠাণ্ডাই হোক, তবু তা সোনাই। অথবা এও বলা চলে যে সোনা তপ্ত হয়ে তরল হলে তার বিশুদ্ধতাই বাড়ে। এইজন্যই যমুনার ক্রোধ অজিতের মনে কোন অবাঞ্ছনীয় প্রভাব সৃষ্টি করেনি। শান্তভাবে সে বলল, যমুনা, অভিশাপের কথা নয়। আমার নিজের ভুতের বাড়ীর কথাই মনে হচ্ছিল।

শিকারী লক্ষ্যবস্তুর প্রতি গুলি ছোঁড়ার পরই বহু ক্ষেত্রেই বুঝতে পারে যে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে অথবা ঠিক জায়গায় লেগেছে। যমুনা অজিতের দিকে তাকায়নি, তবু সে বুঝতে পারল যে তার ক্রোধ অজিতকে আঘাত দেয়নি।

কোন নির্দোষ প্রাণীর প্রতি নিক্ষিপ্ত গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সেই প্রাণীর রগ ঘেঁসে চলে যাবার পর যে অনুতাপ মিশ্রিত হর্ষ গুলি-চালকের হয়, সেই রকমই দশা হল যমুনার।

সেদিন ক্ষেত থেকে ফেরার পথে, যমুনার মনে অজিতের প্রতি ভালবাসার ভাব হয়েছিল। কত বার তার একটি কথা, 'এতেও আনন্দ আছে!' মন্ত্রের মত যমুনা জপ করেছে। এটা ভাল কিম্বা মন্দ, এ বিচার এখন আর সে করতে চায় না। খনির মাটি হতে সোনা বার হয়, এজন্য মাটি বলে সোনাকে সে কেমন করে ফেলে দেবে? সে নিজে খাঁটি না হোক তার দেওয়া মন্ত্র খাঁটি। এই ভেবে ক্রোধ-বশতঃ ঐ রকম কথা বলে ফেলার জন্য তৎক্ষণাৎই যমুনা মনে মনে লজ্জিত হয়ে

উঠেছিল। তার লজ্জা আরও বেড়ে গেল যখন অজিত নিজেই নিজের বাড়ীকে ভূতের বাড়ী বলে ফেলল।

কিছুক্ষণ পরে অজিত জিজ্ঞেস করল, সেদিনকার মতন খারাপ স্বপ্ন আবার তো দেখনি ?

যমুনা যে স্বপ্ন দেখেছিল সে ব্যাপারটা নিজের মনেই রাখতে চেয়েছিল। তবু এই সময় ঐ প্রসঙ্গ উঠে পড়ায় তার ভালই লাগল। সে বলল, না, দেখিনি।

গম্ভীর হয়ে অজিত দুঃখিতভাবে বলল, এটা শুভ লক্ষণ নয়। স্বপ্ন মিথ্যে হলে তাতে মিলে-মিশে তিনটি স্বপ্ন এক মাসের মধ্যে আরও দেখা দেয়। যদি দেখা না দেয় তাহলে প্রথম স্বপ্ন সত্য হয়। যেটা মিথ্যে সেটা বার বারই নিজের কথা বলে। সত্য স্বপ্নের বিষয় একবারই মাত্র দেখা দেয়, দুবার নয়।

ঐ স্বপ্নের সত্যতা সম্বন্ধে যমুনার মনে কিছু কিছু বিশ্বাসের ভাব ছিল। তাকে চিন্তিত দেখে অজিত বলল, যমুনা এজন্য তুমি ভীত হয়ো না। গুরুর কৃপায় স্বপ্নের মন্দ ফল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সে আমি ঠিক করে দেব। কিন্তু এই সময় আমি একটা বিশেষ জরুরী কাজে এসেছিলাম।

শোনবার জন্য উৎসুক হয়ে যমুনা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। অজিত নীরব হয়ে কিছু ভাবতে লাগল। হঠাৎ নিচের খোপ থেকে একটা শব্দ শুনতে পেয়ে সে চমকে উঠল। চাতাল থেকে নেমে মাটিতে দুই হাত রেখে সে ঘাড় উঁচু করে ভাল করে তাকাতেই খোপের মধ্যে কিছু দেখতে পেলে আর অমনি বলে উঠল, আরে, এর মধ্যে যে সাপ !

যমুনা ঐ শুনে আতঙ্কিত হয়ে বলল, মাগো, এ কেত্থেকে এল ! এই খোপে হল্লীর খেলার কাঠ-টাঠ থাকে। যদি সে খোপে হাত দিত তাহলে কি হত ?

কিছুক্ষণ পরে পাড়ার বহু লোকের সামনে অজিত ঐ কালসাপকে না মেরে সুকৌশলে তাকে মাটির ঘড়ায় ভরে বন্ধ করে রাখল। এই দেখে যমুনা অবাক হয়ে রইল। এই হট্টগোলে সে ভুলেই গেল যে অজিত এই সময় অন্য কোন দরকারী কাজে এসেছিল।

স্কুল থেকে ফিরে এসে হল্লীর মনে ভারি দুঃখ হল এই ভেবে যে বাড়ীতে এত কৌতুকপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল অথচ স্বচক্ষে সে তা দেখতে পায়নি। সাপটি কত বড় ছিল, কোত্থেকে এসেছিল, তার বিষ কত ছিল, এই রকম কতই প্রশ্নের ঝড় সে তুলল। এই সাপের দ্বারা দুর্ঘটনা ঘটবার কল্পিত ভীতিতে যমুনা এখনো উদ্বিগ্ন রয়েছে। কাজেই বার বার সাপের প্রসঙ্গ তুলছে বলে হল্লীর প্রতি সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।

হল্লী চাতালের নিচে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিল, ঐ খোপে সাপটি কোথায় তার গর্ত তৈরি করেছিল। কিছু দেখতে না পেয়ে সে খোপে হাত দিয়ে দেখতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনি যমুনা ঘরের ভিতর থেকে দেখতে পেয়ে বাহিরে এসে হল্লীকে এক হাতে নিজের দিকে টেনে এনে এক থাপ্পড় মারল। বলল, কেন এর মধ্যে হাত দিচ্ছিস! যমুনার এমনি আতঙ্ক যেন তখনো ঐ সাপ খোপের মধ্যে বসে আছে।

হল্লী হেসে বলল, এত ভয় কেন করছ মা? গলায় তো সাপের গলাবন্ধ জড়িয়ে রাখেন মহাদেব!

যেন তার কথা শোনেনি এমন ভাবে যমুনা বলল, খবরদার ফের কখনো যদি ঐ জায়গায় হাত দিস!

হল্লী বলল, আমি যদি এখানে তখন থাকতাম সাপকে দুধ খাওয়াতাম। বাটির দুধ সে নিজের ছোট জিভ দিয়ে চুক্-চুক্ করে খেত, তখন কি মজাই হত!

যমুনা বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে সরে গেল। কিছুক্ষণ পরে হল্লী অজিতের হাত ধরে এসে বলল, কাকা কোথাও যাচ্ছিলেন, আমি এঁকে ধরে এনেছি। গল্প শুনব।

যমুনার মনে পড়ে গেল, যে-কাজের জন্য সকালে এসেছিলেন সেই কাজের জন্যই হয়তো আবার ইনি আসছিলেন। আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। যমুনা চট করে চাতালের উপরে একটা বাঁশের চাটাই পেতে দিল বসবার জন্য।

নিচে পা ঝুলিয়ে অজিত চাতালে বসেছিল। অজিতের পা জড়িয়ে ধরে হল্লী কথা বলতে লাগল। সে জিজ্ঞেস করল, ঐ সাপকে মেরে ফেলেছ কাকা?

দূরে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এসেছি বাছা, আমি মারি না ।

তোমাকে কামড়ায় না ? মন্ত্রে বশ হয়ে যায় ?

হ্যাঁ, মন্ত্রে বশ হয়। কিন্তু কোথাও এমনও হয় যে কোন কোন ক্ষেত্রে কোন মন্ত্র কাজ করেনা। এই কথা বলে আড় চোখে অজিত যমুনার দিকে তাকিয়ে রইল।

অজিতের শেষ কথায় মন না দিয়ে হল্লী বললে, কাকা তুমি আমাকে তোমার মন্ত্র-তন্ত্র শিখিয়ে দাও।

শিখিয়ে দেব যখন বড় হবে।

কত বড়, তোমার মতন ?

এই বিষয় ব্যর্থকাম হয়ে সে গল্প বলবার জন্য অনুরোধ করতে লাগল। সে বার বার জিদ করতে থাকায় অজিত বললে, আচ্ছা তবে শোন। এক গ্রামে একটি স্ত্রীলোক থাকত।

হল্লী বললে, হুঁঃ।

সেই স্ত্রীলোকটি দেখতে ছিল যেন রাজকন্যা। কিন্তু একটা বড় দোষ ছিল তার। সে যা জিদ ধরত তা ছাড়তে জানত না।

সে হয়তো মূর্খ ছিল ?

তা আমি জানিনা। তবে হ্যাঁ, তার ছিল এক ছেলে।

কত বড় ?

তোমার মতন। সে খুব বিবেচক ছিল। কখনো কাউকে গল্প বল বলে বিরক্ত করত না।

বিরক্ত হয়ে হল্লী কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই অজিত বলল, আর সকলে তাকে হল্লী হল্লী বলত।

মুখ ঘুরিয়ে হল্লী বলল, থাক, আমি শুনতে চাইনা। গল্প না বলে তুমি তামাশা করছ। এখন তোমার ইচ্ছে নেই, বেশ, কিন্তু কাল তোমায় ছাড়ব না। বলে হল্লী সেখান থেকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে অজিত যমুনাকে বলল, কোন কু-মতলবে আমি তোমার কাছে আসি ভেবে হয়তো বিরক্তি বোধ করছ।

যমুনা চুপ করে রইল।

অজিত আবার বলল, এখানে আমি আসি এটা তুমি ভাল মনে

করনা, কিন্তু আমি তা মনে করিনা। যদি মন্দ অভিপ্রায়ে আসতাম তা হলে সকালের সাপটা আমাকে কামড়ে দিত। তবু তুমি যদি বারণ কর তা-হলে আসবনা।

কাতর হয়ে যমুনা বলল, আমি কখনো বলেছি যে এসনা।

বেশ। আমি চিন্তা করছিলাম, তুমি বারণ করলেও আমি শুনবনা। আমার মনে কোন পাপ নেই, কাজেই ভয় কিসের। আমি তোমাকে বলেছিলাম নতুন করে গৃহস্থালী পাতাও। এতে কোন দোষ নেই। এখানে বাপ-ঠাকুরদাদার সময় হতে এমন তো হয়েই আসছে।

সকালের ঘটনার জন্য যমুনার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ ছিল। বার বার এই ভেবে সে শিউরে উঠেছিল যে আজ অজিত ঐ সময় না এলে না জানি কী অনর্থই ঘটত। এই কারণেই সে অজিতের কথার কোন কড়া জবাব দিতে পারেনি, যদিও এই ধরনের প্রসঙ্গে সে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল।

যমুনা বলল, সকালে কোন জরুরী কথা বলতে এসেছিলে?

সেই জন্যই আবার এখন আসছিলাম। কেউ ভুলে যায় যাক, আমি ভুলবার লোক নই। দরকারী কথা আমার মনে থাকে।

কি কথা ছিল?

কী কথা? বেশ, তাই-ই বলছি। আমি ইতিমধ্যে শহরে গিয়েছিলাম। দারোগাবাবু ভাল মানুষ, খুব সহৃদয়। কোন জটিল মামলা হলে আমাকে চাই-ই। তৎক্ষণাৎ কনেষ্টেবল পাঠিয়ে দেন, বলেন মাতেকে আমার নমস্কার দিয়ো। এই জন্য এইবারও তাঁর সঙ্গে যেতে হয়েছিল। সেখানে ময়রার দোকানে লুচি খেয়ে তাড়াতাড়ি কাছারির দিকে যাচ্ছিলাম—সেই সময় বড়বাজারের চৌমাথায় জগরামকে দেখতে পেলাম।

যমুনা চম্‌কে উঠল। জগরাম সেই ব্যক্তির নাম যার সঙ্গে বৃন্দাবন বিদেশে পালিয়েছে। সে বলল, নয়া গ্রামের জগরাম?

হ্যাঁ, সে ছাড়া আর কে? এখন সে বাবু হয়ে গেছে। জান বাবু কেমন হয়? বেতের ছড়ির মতন হাত-পা, মুখ চোষা-আমের আঁঠির মতন, পরনে নতুন ধরনের ধুতি, আর কোমর পর্য্যন্ত লম্বা কালো রঙের কোট পরেছে। কেউ যেমনি ছদ্মবেশ ধারণ করুক না কেন, আমার চোখে

ধুলো দিতে পারে আমি এমন নই। দূর থেকে দেখেই চিনে ফেললাম। শিবু বললে, জগরাম নয়। আমি তখন তার নাম ধরে ডাকতেই সে তক্ষুনি আমার কাছে এল।

যমুনা জিজ্ঞেস করলে, কোন কথা হল?

কথাই যদি না হবে তবে তাকে কেন ডেকেছিলাম। সে বলল, সেখানকার জল-হাওয়া সহ্য হলনা তাই এখানে এসেছি।

বাবুরা এমনি জীব। অল্প বাতাসেই উড়ে যায়, আর ডোববার জন্যও গভীর জলের দরকার হয়না; আর সেখানে যেদিকে তাকাও সেই দিকে কলের জলের মোটা ধারা ঝরছেই।—বলে অজিত হাসতে লাগল।

এই সময় অজিতের এই হাসি যমুনার ভাল লাগল না। সে বলল ওঁর বিষয় কোন কথা হয়নি?

কার সম্বন্ধে, বৃন্দাবনের সম্বন্ধে? সময় কোথায় ছিল। সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছিল আর কাছারি খুলে যায় ঠিক দশটায়।

যমুনা ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, অন্যের জন্য তোমার চিন্তা হবে কেন। আমি নিজে গিয়েই সব কথা জিজ্ঞেস করে আসব।

অন্যের জন্য যদি আমার চিন্তা নাই-ই থাকবে তাহ'লে তাকে কাছে ডাকবই বা কেন? বৃন্দাবন সম্বন্ধে কোন্ কথাই বা গোপন আছে, যে আমি তার কাছে জিজ্ঞেস করব। তোমাকে একটা প্রশ্ন করছি। বল, তিনি যদি এখনো পর্যন্ত বেঁচেই থাকতেন তাহলে জগরামের সঙ্গে কেন এলেন না? হঠকারী জগরাম, একজনকে মরবার জন্য সঙ্গে নিয়ে গেল আর একলা নিজে ফিরে এল। তুমি সব জান! স্বপ্নে—

যমুনা বসে ছিল, উঠে দাঁড়াল। রাগান্বিত ভাবে বলল, আবার সেই কথা! তুমি চাও সকলে মরে যাক তাহলে আমি তোমার বাঁদী হয়ে থাকব। আমি এত বোকা নই যে কিছুই বুঝি না। কিন্তু তুমিও মনে রেখ এমন করে কারও অনিষ্ট চিন্তা করলে কারও সর্বনাশ হয় না।

রাগের চোটে হাতের চুড়ির ঝঙ্কার দিয়ে সে চট করে ঘরের ভিতরে চলে গেল।

অজিত যেখানে ছিল সেইখানেই নীরব হয়ে বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে ঘরের ভিতরের দরজার কাছে গিয়ে বলল, তুমি ক্ষুব্ধ হয়েছ যমুনা,

কিন্তু বিরক্ত হবার কোন কারণ এতে নাই। আমি ভেবেছিলাম জগরামের মুখের কথা আমি কেন তোমাকে শোনাব, তবুও তুমি বল কারও জন্য আমি ভাবি না! বেশ, জগরামকে সঙ্গে এনে এখানে তোমার কাছে উপস্থিত করে দেব, তাহলেই তো হবে? তবে এখন যাই?

ভিতর থেকে যমুনার কোন উত্তর এলনা। সেখানে যমুনা কাপড়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

[৯]

নিজের পতির সঙ্গে জগরামকে যমুনা আগেও দেখেছিল। কিন্তু সেদিন ঘরের ভিতর থেকে অজিতের সঙ্গে তাকে দেখে সে ধরতে পারল না যে ঐ ব্যক্তিকে সে পূর্বে দেখেছে। যেন গত জন্মের কোন জীব নবজন্ম নিয়ে দেখা দিয়েছে। তার চেহারা, তার পরিচ্ছদ, তার কথা-বার্তা-সব কিছুই বদলে গেছে।

উঠোনের দরজায় উঁকি দিয়ে অজিত বলল, নাও, দেখ, জগরাম এসেছেন।

জগরামের সঙ্গে কথা বলবার জন্য যমুনার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল ঠিকই, কিন্তু এই সময় তার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য সে নিজেই অধীর হয়ে উঠল। তার ভয় হল যে এই নির্দয় লোকটা হয়তো তার (যমুনার) কোন ধারণাকে ভেঙে দেবার জন্যঃএসেছে।

জগরাম সকৌতুক দৃষ্টিতে বাড়ী দেখে বলল, ভাই, ভাল জিনিষের উপরেই হাত দিয়েছ।

এই সময় দেখা গেল ঘোমটায় মুখ ঢেকে যমুন ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। জগরাম চুপ করে রইল। এই ভেবে, নয় যে তার কথা যমুনা শুনতে পেয়েছে; কিন্তু এই জন্য যে সে কল্পনাও করেনি যমুনা এত সুশ্রী। জগরাম যে-ভাবে তাকাচ্ছিল সেই তাকানোর ভঙ্গী অজিতের কাছে বড়ই লজ্জাজনক মনে হল। যমুনার দৃষ্টি সেদিকে ছিলনা দেখে অজিত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

যমুনা সেখানে বসতেই অজিত কাজের কথা পাড়ল। বলল,

ইনি বলেন আমি কারও জন্য ভাবিনা যে-হেতু তোমার কাছে বৃন্দাবনের বিষয় কিছু জিজ্ঞেস করিনি। এখন তুমি এসেছ, তুমিই বল তাহলে এঁর বিশ্বাস হবে।

কি অভদ্র ব্যাপার! এই বলে জগরাম সেখানে এক কোনায় থুতু ফেলল।

অজিতকে নীরব থাকতে দেখে সে আবার বলল, বোকার মতন কি অদ্ভুত চেহারা নিয়ে বসে আছ। কেউ কারও বাড়ী এলে পান-তামাক দিয়ে তার খাতির করতে হয়। ভদ্রলোকের কাজ তো এই-ই। নিজের স্বার্থের জন্য, হ্যাঁ, গভীর স্বার্থের জন্যই এখানে আমাকে টেনে এনেছ আর শূন্য হাতেই বিদায় করতে চাচ্ছ। বেশ, দেখা যাবে!

জগরাম নিজের পরিহাসে নিজেই হাসতে লাগল। অজিত সমস্যায় পড়ে গেল। সে জানত পান-তামাকের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। সে ভাবল কোন রকমে বৃন্দাবনের সংবাদ শুনিয়ে দিতে পারলে তার প্রাণ বাঁচে।

অনেক রকম টাল-বাহানার পর জগরাম প্রয়োজনীয় কথার প্রসঙ্গ পাড়লে। যমুনাকেই সম্বোধন করে সে বললে, তুমি তো জানই বৃন্দাবন এক নোংরা কুলীর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিল। কুলীর একটি যুবতী কন্যা ছিল, বুঝলে, সেই-ই সব ফ্যাসাদের মূল। বন্ধুত্ব পাতাবার কিছু দিন পরেই কুলীর অসুখ হল, অসুখ হয়েছিল কিম্বা সে অসুখের ভান করেছিল তা আমি জানি না। তাদের বাড়ী পৌঁছে দেবার জন্য বৃন্দাবন নিজের ট্যাঁকের টাকা নিয়ে প্রস্তুত হল। ব্যাপার কি জানবার জন্য সকলে খোঁজ-খবর নিচ্ছিল। ঐ কুলীরা কোনো দেশী রাজ্যের বাসিন্দা ছিল! সেখানকার পুলিশেরা এখানকার পুলিশের চেয়ে কম সজ্জন নয়। বাছা বৃন্দাবনকে দুদিন পরেই সেখানে গেরেপ্তার করা হল। তাকে বন্দী করেই সঙ্গে সঙ্গে বলে দেওয়া হল যে বেশ দীর্ঘ-মেয়াদী শাস্তি হল তার। আইনত যে-শাস্তি দেওয়া হয় তাকেই সেখানে দীর্ঘ-মেয়াদী শাস্তি বলে, কিন্তু সেখানে জেলখানা এতই ভাল যে বেশ সুস্থ সবল মানুষও সেখানে এক মাসের মধ্যেই এই পৃথিবী হতে মুক্তি পায়। এর পর কি হল আমি জানিনা। তা বলেও কোন লাভ নাই।

এই প্রসঙ্গ শুরু হবার পূর্ব হতেই যমুনার মনে আতঙ্ক হচ্ছিল। সব কথা শোনবার পূর্বেই, শরীর কেমন করছে বলে সে উঠে চলে গেল।

ভিতরে যাবার সময় যমুনার চেহারা দেখে অজিতের মনের অবস্থা হল চাবুক-খাওয়া জীবের মতন। দুঃখ যে এত সহজে কারও রক্ত শোষণ করতে পারে অজিত এটা এই প্রথম দেখল।

সেখান থেকে বেরিয়ে এসে অজিত জগরামকে বলল, তুমি গেঁয়ো-গোয়াঁড়ের মতন এসব কি কথা বললে, একটু ভাল করে বলতে পারতেনা ?

এই-ই হচ্ছে আমার দোষ, দাঁত বের করে জগরাম বলল, মিথ্যাকে ঘৃণা করি। যা পেটে তাই মুখে। বানিয়ে কথা বলা হঠকারিতা। দেখলে তুমি এর ঢং, কেমন তৈরি হয়ে এসেছিল। নাটকে আর থিয়েটারে বেশ রোজগার করতে পারবে। এ আমার চোখে ধুলো দেবে ? রাম-রাম ! আমি মেয়েমানুষের ধাত বুঝি। এ পর্যন্ত কত জনের সঙ্গে হয়তো কত খেলাই খেলেছে, আর ভাব দেখায় যেন কতই ভাল মানুষ। আমাকে দুদিন গ্রামে থাকতে দাও তারপর দেখে নিও—

জগরাম ভাবছিল তার এই সব কথায় অজিত খুশী হবে, কিন্তু সে জগরামের কথা শেষ হবার আগেই রেগে বলে উঠল, কি বকছ ? ভাল ঘরের বউ-ঝি সম্বন্ধে মুখ সামলে কথা বল। আমি বুঝতে পারিনি শহরে হয়ে তুমি এমন বেয়াদব হয়ে গেছ। আমার এই লাঠি দেখছ। ফের যদি আবোল-তাবোল কথা বল তাহলে এই লাঠি দিয়ে তোমার দাঁত ভেঙে দেব।

জগরাম ঘাবড়ে গেলেও নিজেকে সামলে নিয়ে হাসবার চেষ্টা করে বলল, বেশ, বন্ধু, আমি হাসছি আর তুমি রেগে উঠেছ।

অজিত বলল, এসব চালাকী অন্যের সঙ্গে কর, এখানে বোকা-হাবা কেউ নেই। ফিরে যাবার ভাড়ার টাকা তোমার কাছে আছে; যাও, এখান থেকে সরে পড়।

গোঁয়ার মানুষের কাছ থেকে সরে পড়াই জগরাম সঙ্গত মনে করল। সে প্রথমে বুঝতে পারেনি যে অজিত এত ভয়ঙ্কর। বুঝতে পারলে বেড়িয়ে-টেরিয়ে মজা করবার লোভেও সে এখানে আসতনা।

অজিতের চোখে জল এল। কেন সে এই লোকটিকে ডেকে আনল? তারও ধারণা ছিল যে বৃন্দাবন এই পৃথিবীতে আর নাই। এই ধারণা যমুনার মনেও ঢুকিয়ে দেবার জন্য কোন ত্রুটি সে করেনি। কিন্তু এই সময় সে নিজেই নিজের সেই ধারণাকে সমূলে নষ্ট করে ফেলবার জন্য অনেক সম্ভব-অসম্ভব কথা এক সঙ্গে চিন্তা করতে লাগল। তার ইচ্ছে হল সে যমুনাকে গিয়ে বলে যে—আমি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জগরামকে শিখিয়ে পড়িয়ে তোমার কাছে এনেছিলাম।

কিন্তু এ কথা যমুনাকে সে বলতে পারল না। ব্যথিত চিত্তে সে নিজের বাড়ী ফিরে গেল।

[১০]

হল্লী মায়ের বিচিত্র পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলে। যমুনা মুখ ভার করে গম্ভীর হয়ে ছিল। এর কারণ জিজ্ঞেস করায় হল্লী মায়ের কাছে তাড়া খেল। পাড়ার কয়েকজন স্ত্রীলোক ম্লান মুখে যমুনার ওখানে এসেছিল। যমুনা তাদের সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করেছিল তাও হল্লী লক্ষ্য করেছিল। ঐ সব স্ত্রীলোকেরা যমুনার নিন্দে-মন্দ করতে করতে ফিরে গেল। হল্লী সমস্যায় পড়ে চিন্তা করছিল, ব্যাপার কি। এই সব ব্যাপারের কারণ টের পেল বাইরে থেকে। বাইরে এই খবর ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হয়নি যে যমুনার বাড়ীতে শহরের একজন এসে বৃন্দাবনের মৃত্যুর সঠিক সংবাদ দিয়ে গেছে।

হল্লী সজ্ঞানে তার পিতাকে কখনো দেখেনি। তবুও সে খুব কাতর হয়ে উঠল। তার ইচ্ছে করছিল সে উঠোনের মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে। কিন্তু তার এই দুঃখে মা-ই যেন বিরুদ্ধতা করলেন। শুধু মুখ ভার করে থাকলে কি আর হয়। এমন অবস্থায় তো জোরে কান্না-কাটি করতে হয়। মা এরকম না করার জন্য, পাড়ায় মায়ের নিন্দে হল্লী নিজের কানে শুনে এসেছিল। সে মায়ের কাছে এসে, বাবা, এইটুকু বলা মাত্র যমুনা তাকে ধমক দিয়ে বললে, যা, সরে যা এখান থেকে। এই সব কথায় কেন কান দিচ্ছিস? যমুনা জানত না যে হল্লী তার বাবার মৃত্যু সংবাদ শুনেছে।

হল্লীর ভয় হল, মা পাগল হয়ে যায়নি তো। গত রাত্রি হতে এই রকমের অবস্থা। আজ সকালে থালায় জলখাবার যেমন ছিল তেমনি ভাবেই রেখে যখন সে উঠে গিয়েছিল, মা তবুও কিছু বলেননি এবং দুপুরে যখন মাটির কলসী থেকে ঘটিতে জল ঢালতে গিয়ে কলসী ভেঙে গেল, তখনো সে জন্য মা তাকে কোন কথা বলেন নি। এমন দুঃসময়ে মায়ের পাগল হওয়াটাও ওর কাছে মায়ের পক্ষে অপরাধ বলে মনে হল।

ছেলেরা যেখানে খেলা করছিল হল্লী উদাস ভাবে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। একটি ছেলে, বলল, আমাকে ছুঁয়োনা, ছুঁলে চান করতে হবে।

রেগে হল্লী বলল, এখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। দেখি কে বারণ করে। রাস্তা কারও বাপের নয়।

রাধে তার বন্ধু, সে কাছে এসে বন্ধুত্বের দাবীতে বলল, তোমার মা খুব খারাপ।

কেন, উনি কি কারও কিছু চুরি করেছেন?

তোমার বাবা মারা যাওয়া সত্ত্বেও তিনি কাঁদেন নি। আমার বাবার মৃত্যুতে মা তিন দিন, তিন রাত এক টানা কেঁদেছিলেন। রুটিও খান নি। যে দেখেছিল সেই-ই ধন্য ধন্য বলে মায়ের প্রশংসা করেছিল। বাবার মৃত্যুর দুই দিন আগে আট আনার রঙীন চুড়ি কিনেছিলেন শোকের জন্য তাও ভেঙে ফেলে দিলেন।

হল্লীর মনে পড়ল, ঠিক বলেছে। সেই রঙীন চুড়ির ভাঙা টুকরা সেও হাতে তুলে নিয়ে দেখে ছিল। পাশের স্ত্রীলোকেরা বারণ করায় সেগুলো ঐখানেই ফেলে রেখে তাকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল।

হল্লীকে নীরব দেখে রাধে আবার বলল, তুমি তোমার মাকে শোক পালন করবার জন্য বুঝিয়ে বল। তিনি খুব নিন্দনীয় কাজ করেছেন।

হল্লীর রাগ হল, মায়ের নিন্দে করছিস—বলে সে রাধের গালে, তড়াং করে এক চড় মেরে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

বাড়ীতে এসে চুপ করে এক ধারে বসে কাঁদতে লাগল। যমুনা কোন কাজে ঐ দিক দিয়ে যাচ্ছিল, সে কঠোর হয়ে জিজ্ঞেস করল, কাঁদছিস কেন?

এতক্ষণ সে চাপা গলায় কাঁদছিল, এইবার জোরে কেঁদে উঠল। সে কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু 'বাবা'—'বাবা' শব্দ ব্যতীত আর কিছু বলতে পারল না।

আমি কি করব, বসে কাঁদ, বলে যমুনা সেখান থেকে চলে গেল। এবার কিন্তু তার কণ্ঠস্বর আগের মতন রূঢ় ছিল না।

কিছুক্ষণ পরে অজিত এসে উপস্থিত হল, তখনো হল্লী সেইখানেই বসেছিল। সে তখন চুপ করে ছিল বটে, কিন্তু তবু কান্নার চিহ্ন তার মুখ থেকে তখনো মুছে যায়নি।

অজিত আদর করে জিজ্ঞেস করল, কেন কাঁদছিস বাছা?

সে যেখানে ছিল সেইখানেই চুপ করে বসে রইল। তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে অজিত বলল, কিসের জন্য দুঃখ করছিস? ছেলে মানুষ, প্রফুল্ল চিত্তে খেলা কর আর পড়াশোনা কর।

হল্লী বলল, দিবিয়ার কাকী বলছিল—খারাপ কথা বলছিল। ছেলেরা বলে—আমাদের ছুঁয়োনা, তোমার বাপ মরে গেছে। মায়ের শোক-অশৌচ পালন করা উচিত।

অজিত বলল, ধুৎ, পাগল হয়েছিস।

হল্লী বলল, বাবা দূর বিদেশে একা মরে গেলেন, কতই না কষ্ট তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। তাঁর জন্য মায়ের চোখের জলও পড়ল না আর আমিও কাঁদলাম না, তাঁর আত্মা কী ভাবছে।

তার থেমে-যাওয়া অশ্রু আবার চোখে দেখা দিল।

বৃন্দাবনের জন্য অজিতের কোন দুঃখ নাই, কিন্তু হল্লীর চোখের জল তাকে বিচলিত করলে। এই ছোট্ট বালকের ছোট হৃদয় না জানি কত দূরত্ব অতিক্রম করে নিজের পিতার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। অজিত বুঝতে পারল হল্লীর এই মানসিক অবস্থা নিছক মূর্খতা নয়। তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, কে বলেছে যে উনি মারা গেছেন? যমুনা?

মাথা নেড়ে হল্লী বললে, তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু তিনি কিছু না বলে ধমকে দিলেন।

তাহলে অনর্থক কেন তুই কাঁদছিস? তোর বাবা মারা যাননি। সে

দিন তো তুইও শুনেছিস তোর মা বলছিলেন যে উনি একদিন এখানে নিশ্চয়ই আসবেন, যতই না কেন বিলম্ব হোক, তাঁর কথা মিথ্যা হতে পারে না।. বলেছিলেন কিনা? তাহলে কেন তুই মিছে দুশ্চিন্তা করছিস। কাঁদিসনে বাছা।

একজন এসে খবর দিয়ে গেছে, সে কেন মিথ্যে কথা বলবে?

জগরামের উদ্দেশে কিছু গালি-গালাজ করে অজিত হল্লীর মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিলে যে, জগরাম মিথ্যে কথা বলেছে। ছেলেটিকে প্রসন্ন করবার জন্য সে নিজের ধারণার বিরুদ্ধে কথা বলেও মনে মনে সন্তুষ্ট হল।

হল্লীর মনে পিতা মারা যাননি বলে যে-আনন্দ হল তার চেয়েও বেশী আনন্দ হল এই ভেবে যে মায়ের বিরুদ্ধে নিন্দবাদ মিথ্যে। তার মা কম ভাল কিসে? সে কল্পনায় ভেবে নিলে যখন তার বাবা মারা যাবেন তখন মা প্রমাণ করে দেবেন যে তাঁর শোকের তুলনায় রাধের মায়ের শোক কিছুই নয়।

মাকে গিয়ে বলে আসি, বলে সে চট করে ঘরের ভিতরে দৌড়ে গেল।

[১১]

কিছুদিন ধরে অজিত যমুনার সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। তার মনে হয় যেন ইচ্ছে করেই যমুনা তার থেকে দূরে দূরে থাকে। তবু অজিত আসে আর হল্লীর সঙ্গে খোশ-গল্প করে তাকে খুশী করে ফিরে যায়।

আজ ঘরের বাইরে নিম গাছের তলায় ঐ দুজনের কথা-বার্তা বেশ জমে উঠল। সন্ধ্যা হয়েছে, তবু এখনো অন্ধকার হয়নি। হল্লী বলল, এখনো গল্প বলার সময় হয়নি কাকা? তুমি বলেছিল, দিনে গল্প বললে মানুষ রাস্তা ভুলে যায়। কেউ যদি কলকাতায় যাবার পথ ভুলে যায় তাহলে তো বিপদ।

অজিত জিজ্ঞেস করল, কলকাতার রাস্তা কেন?

কলকাতার সঙ্গে তার মনের সম্বন্ধ কি হল্লী সেটা প্রকাশ করতে চায়না।

কিছু দিন ধরেই মায়ের শুকনো চেহারা আর উদাস-উদাস ভাব দেখে আজ তার মনে হয়েছিল যদি কিছু টাকা কোথাও হতে জোটে, তাহলে সে এখনি কলকাতায় রওনা হবে। মায়ের বিশ্বাস হচ্ছেনা যে বাবা মরেন নি। তা না হলে এমন ভাবে তাঁর বিষণ্ণ হয়ে থাকার অন্য কি কারণ হতে পারে? এসম্বন্ধে তার সঙ্গে তিনি কোন কথা বলতেও চান না। কথা পাড়লে সে তাঁকে বুঝিয়ে বলতে পারে। এখন সে কোন রকমে কলকাতায় পৌঁছতে পারলে বাবাকে খুঁজে সঙ্গে করে না এনে ছাড়বে না। কিন্তু এও সে জানে, তার এই কথা শুনে লোকে হাসবে। এই জন্য সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, দেখ কাকা একটা তারা বেরিয়েছে। যে একটা তারা দেখে সে রাজা।

অজিত বলল, তাহলে তো তুমি রাজা হবে।

হল্লী বলল, মা আমাকে ক্ষুদে রাজা বলেন, আমি কিন্তু তেমন রাজা হতে চাইনা। তবে হ্যাঁ, গল্পের সেই কাঠুরিয়ার মতন কোন শহরে পৌঁছতে পারলেই তক্ষুনি রেলগাড়ীতে চেপে কলকাতায় চলে যাব।

এই বলে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে, ফট করে ঐ প্রসঙ্গ ছেড়ে বলল, অনেক গুলি তারা বেরিয়ে পড়েছে। ছেলেরা বলে এরা সব রামচন্দ্রের গোরুর পাল। চরে বেড়াবার জন্য রাত্রিতে এদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

রাত্রে কখনো চরবার জন্য গোরু ছাড়া হয়?

ছাড়া তো হয়না, বলে হল্লী কিছু চিন্তা করতে লাগল।

অজিত বলল, এই সব গোরু দিনের বেলায় কোথাও চরে বেড়ায় রাত হলে নিজেদের স্থানে ফিরে যায়। এই-ই কিনা? মাঝখানে যে জায়গাটা খালি দেখা যাচ্ছে, সেখানে এই অন্ধকারের গাদা রেখে দেওয়া হয়েছে। সারা রাত ধরে খাবে।

হল্লীর হৃদয় কবিত্বের কোন অচিন্তিত রাজ্যে গিয়ে পুলকিত হয়ে উঠল। বলল, আহা, কেমন সুন্দর এরা! আমাকে যদি এদের রাখাল করে দেওয়া হয় তাহলে শুধু কলকাতা কেন, সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে পারি এদের চরাতে চরাতে।

সানন্দে অজিত বলল, এটা তো খুব ভালো কথা ভেবেছ হল্লী?

হল্লা তখন নির্ভয়ে বলতে লাগল, কাকা, আমার তো ইচ্ছে করে কলকাতায় বেড়াতে যাবার। কেউ যদি আমাকে বাধা না দেয় তাহলে এখনি বেরিয়ে পড়তে পারি। একটা ছোট লাঠি নেব কাঁধে আর সেই লাঠির মাথায় পোঁটলায় থাকবে বাঁধা কিছু জলখাবার। এর বেশি আর দরকার বা কি! আমি একাই হেঁটে চলে যাব। পথে পড়বে বড় বড় নদী; বড় বড় নির্জন জঙ্গল; নগর, গ্রাম, পাহাড় পর্বত, কত কি-ই না দেখতে পাব? আমি এগিয়ে যাব। থামব না। আমার কিসের ভয়? একদিন ঠিক জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হবই।

অজিত খুশী হয়ে বলল, বাঃ বাঃ এই তো সাহসীর কাজ। আমিও তোর সঙ্গে যাব।

হল্লীর মনে পড়ে গেল একবার তার মাও তার সঙ্গে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। হল্লীর যশোলিপ্সায় অংশীদার হবার জন্য সকলেরই ইচ্ছে হচ্ছে। সে তো যমুনাকে বলেই দিয়েছিল যে কলকাতায় স্ত্রী-জাতিরা যেতে পারেনা, কিন্তু কাকাকে কি বলে বারণ করবে। এটা সে ভেবে পাচ্ছেনা। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে বলল, আমি পাছে রাস্তা ভুলে যাই এই ভয়েই তো সঙ্গে যেতে চাইছ। না, আমি পথ ভুলবনা। ম্যাপে সব.পথ-ঘাট ভাল করেই লেখা আছে।

অজিত তৎক্ষণাৎ তার কথা মেনে নিল। বলল, আমি গেঁয়ো মানুষ, লেখাপড়া শিখিনি বাছা, সঙ্গে গেলে তোমার কোনই সুবিধে হবে না।

সসংকোচে হল্লী বলল, কাকা: তুমি অনেক মন্ত্র-তন্ত্র জান। আমি তোমার মন্ত্র-তন্ত্র শিখে নিতে পারলে খুব ভাল হয়। কখন কোন সময় বাবাকে সাপে—

ছি ছি এমন কু-চিন্তা করতে নেই। তোমার মা একথা শুনলে ক্ষুণ্ণ হবেন।

না, আমি তাঁর সামনে বলবনা। তাঁর দুঃখ হয়। বাবার সম্বন্ধে তিনি আমার সঙ্গে কোন কথাই বলেন না। আমি কিছু বলতে গেলেই বিরক্ত হয়ে ওঠেন। কখনো-কখনো আমারও বাবার উপর রাগ হয়। তিনি কেন মাকে ছেড়ে আছেন? মনে হচ্ছে মাও এখন তাঁর প্রতি তেমন প্রসন্ন নন।

তুমি কেমন করে বুঝলে ?

আমি এও কি বুঝিনা ?—তুমি কোন একজন লোককে আমাদের বাড়ীতে সঙ্গে করে এনেছিলে ?

তোমাকে মা বলেছেন ?

না, সেই লোকটিই বলেছিল যে বাবা মারা গেছেন। মাকে তুমি সান্ত্বনা না দিলে মা পাগল হয়ে মরে যেতেন।

কিন্তু তিনি তো আমার প্রতি অপ্রসন্ন।

না অপ্রসন্ন নন। তিনি তোমার খুব প্রশংসা করছিলেন।

অজিতের চেহারায় প্রসন্নতা ফুটে উঠল। সে জিজ্ঞেস করল, কি বলছিলেন ?

হল্লী মুশকিলে পড়ে গেল। তার মনে ছিলনা মা কি বলেছিলেন। তবুও সে বলল, সেই সাপধরার কথা। বাঃ! সে-দিন কেমন কৌশলে সাপটা ধরেছিলে।

এ তো সেই পুরানো কথা। একথা শুনে অজিত যে খুশী হল তেমন মনে হল না, নেশার যথোচিত মাত্রার মতন এই কথা দেহে মনে নব শক্তি সঞ্চারিত করতে পারেনি।

হল্লী পরক্ষণেই আবার বলল, কাকা তুমি রাজা হবে ? রাজা ?

হ্যাঁ রাজা। দিবিয়ার কাকী মাকে বলছিল—আজ কাল অজিত মাতে তোমার মন্ত্রী, কবে সে রাজা হবে ? আমি বাইরে যাচ্ছিলাম, শুনতে পেলাম, মা বলছেন—রাজা হবে কি বাদশা হবে, তুমি কেন কারও কথায় থাক ? এই বলে মা চট করে ঘরের ভিতরে চলে গেলেন।

অজিত দুহাত উপরের দিকে তুলে হাঁই তুলে বলল, তোমার মায়ের সঙ্গে মতিলাল চৌধুরীর সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার ছিল। কি জানি কখন ক্ষেত থেকে ফিরবেন।

অজিতের দিকে তাকিয়ে হল্লী অনুভব করল যে-কথা কিছুক্ষণ আগে সে বলে ফেলেছে, তাতে এমন কি ছিল যা বলা উচিত ছিলনা। তবু এর কোন কারণ সে বুঝতে পারল না।

যমুনা বিস্মিত হল এই জেনে যে মতিলাল চৌধুরী চারশত টাকারও বেশি তার কাছে দাবি করেছেন। সে বলল, এতটাকা হল কেমন করে? আমি তো প্রতি বছরই শোধ করছি।

অজিত জিজ্ঞেস করল, টাকা দিয়ে রসিদ নিতে?

হ্যাঁ।

কাউকে দিয়ে সেই রসিদ পড়িয়ে নিতে?

যমুনা চুপ করে রইল। কারও কাছ থেকে টাকার রসিদ নেওয়ার মানে হচ্ছে তাকে অবিশ্বাস করা। রসিদ নিয়ে সেই রসিদ অন্যকে দিয়ে পড়িয়ে শোনাটা যমুনার বিচারে মড়ার উপরে ক্রমাগত খাঁড়ার কোপ দেবার মতন। কিন্তু এ সময় সে ঐ-সব চিন্তার কথা খুলে বলতে পারল না। এই নিয়ে একবার তাকে যে-লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল, সে-লজ্জা এখনো তার মর্মে বিঁধে আছে। সে-দিন প্রথমবার নিজেই মতিলালকে টাকা স্বহস্তে দেবার জন্য গিয়েছিল। তাকে টাকার রসিদ দেওয়ামাত্র, পাশে উপবিষ্ট একজন পড়বার জন্য রসিদটা তার হাত থেকে নিয়ে নিল। ঐ ব্যক্তি হয়তো বোঝাতে চেয়েছিল যে সে মূর্খ নয়, লিখতে-পড়তে জানে। এই দেখে মতিলাল বললে, বেশ, ভাল করে পড়িয়ে নাও যমুনাদেবী। আমি মিথ্যে রসিদ তো লিখে দেইনি। এটা তো কলিযুগ, মহাজনেরা তো অসাধু। দরকারের সময় বিপন্ন ব্যক্তিকে অনাহার থেকে বাঁচাতে হলে আমরাই বাঁচাই; পালন করতে যদি হয় আমরাই পালন করি, তবুও পরিণাম,—পরিণাম কি হয়—কি হয়, তুমি চুপ করে আছ কেন ধন্নি? পাশে উপবিষ্ট লোকটি বলল, পরিণামে মহাজন আর ঋণদাতাদের লোকে বলে পয়লানম্বরের জোচ্চর! লজ্জিত হয়ে প্রথম ব্যক্তিটি রসিদটি যমুনার হাতে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু মতিলাল জোর করে তাকে দিয়ে রসিদটা পড়িয়েই নিল। তার পড়া শেষ হলে অন্য ব্যক্তিদেরও ঐ রসিদ পালা করে পড়তে হল। দেনাদার-দের অবিশ্বাসের বিষয় নিয়ে যখন সকলে নিজের নিজের ভিন্ন ভিন্ন মত, চাপা আর খোলা হাসি হেসে হেসে ব্যক্ত করা শেষ করল, তখন মতিলাল আবার বলল, এখনো যদি যমুনাদেবীর বিশ্বাস না হয়ে থাকে

তাহলে অন্য কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নিতে পারেন। তোমরা সকলেও তো অবিশ্বাসের কাজ করতে পার। আজকাল বিশ্বাসের দিন আর নেই যমুনা। সে-দিন ওখান থেকে যমুনা মনে কষ্ট পেয়েই ফিরেছিল। আজ আবার সেই রসিদ পড়াবার কথা যমুনার কাছে উঠল।

যমুনাকে নীরব থাকতে দেখে অজিত বলল, যদি কাউকে দিয়ে রসিদ না-ই পড়ালে তাহলে রসিদ নেওয়া আর না নেওয়া দুই-ই সমান। স্ত্রীলোকেরা এই রকমই মূর্খ। চতুর মানুষেরা এইজন্য নিজেদের ফাঁদে তাদের আটকে সর্ব্বনাশ করে তাদের। কেউ আমার সঙ্গে চালাকি করুক! তাকে জেলখানার রাস্তা না দেখিয়ে আমি ছাড়বনা।

যমুনা ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, চৌধুরী কবে কাকে মিথ্যে রসিদ লিখে দিয়েছে যে তুমি তাঁর সম্বন্ধে এই সব কথা বলছ?

অজিত কৃত্রিম বিস্ময়ের ভাবে বলল, না, না, চৌধুরী বড় ঋষি, মুনি। তাঁর সম্বন্ধে এরকম কথা বললে পাপ হবে!

যমুনা সংকটময় পরিস্থিতিতে পড়েছে। নানা রকম অবিশ্বাসের মধ্যে তার বিশ্বাসের যে-স্থানটুকু আছে, তা খুবই ছোট। তার উপরেই সে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু বুঝতে পারছেনা যে সেখানে সে স্থির হয়ে থাকতে পারবে কি পারবে না।

যমুনার মৌনতা অজিতের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। সে ভাবল তার ব্যঙ্গোক্তির মর্ম না বুঝে মতিলালকে যমুনা সত্যই ঋষি-মুনির অবতার বলে মেনে নিয়েছে। তাহলে এখনও বসে আছ কেন, ওঠ, লোহার সিন্দুক খুলে টাকার তোড়া বার করে আন। মতিলাল তো আর মিথ্যে বলবার লোক নন, তাঁর প্রাপ্য তাঁকে দেওয়াই সঙ্গত।

যমুনা বলল, আমার ঘরে কি লোহার সিন্দুক আছে? তুমি গিয়ে নিজে দেখে এস যদি কোথাও কিছু থাকে।

অজিত হেসে উঠল। সরসভাবে সে বলল, দেখ যমুনা, তুমি সত্য-যুগের মানুষ, কিন্তু এই যুগ সত্যযুগ নয়। কলিযুগের জন্য কলিযুগেরই মতো হতে হয়।

যমুনার মুখের ভাব কঠোর হয়ে উঠল। তবু অজিত সেই কঠোরতা

উপেক্ষা করে বলল, তুমি এরকম ভাবে বেশি বিশ্বাস করলে পৃথিবীতে সবাই তোমাকে ঠকাবে।

আমার কাছে এমন কি আছে যে আমাকে কেউ ঠকাবে। যদি কিছু থাকত তাহলে কি চৌধুরীকে চার-পাঁচশ টাকা দিয়ে দিতামনা?

তা হলে চৌধুরী যা দাবি করছেন সেটা কি তাঁকে তোমার দেয় নয়? নয় কি?

না।

না কেন, কিছু আগেই তো বলছিলে টাকা থাকলে কি তাঁকে চার-পাঁচ শ দিতাম না! চৌধুরী এই-ই তো চান। আমি বুঝতে পারছি তুমি ফাঁদে আটকা পড়বে। আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারব না, আর কোন উকিল-ব্যারিষ্টারই বা কেমন করে রক্ষা করবে? আমি যা বলি তাই যদি তুমি কর তাহলে কিছু হতে পারে।

তুমি যা বলবে তাই করা ছাড়া আর কি করব। চৌধুরী আমার সব কেড়ে নিতে চাচ্ছেন, কিন্তু উপরে তো ভগবান আছেন।

উপরে ভগবান আছেন বটে, কিন্তু এসময় তিনি চৌধুরীর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবেন না।

ব্রাহ্মণ-ভোজন আর দান-ধ্যান পুণ্যকর্মাদি কি তিনি বিনা স্বার্থে করেন? তাঁর খাতায় এই সব ভগবানের নামেই লেখা হয়। দেনাদার-দের টাকার সুদ চড়া করে লিখে, মামলায় নিজের পক্ষে ডিক্রি করিয়ে নেয়। এজন্য ভগবানকেও ফ্যাসাদে পড়তে হবে। যাক, এসব পরিহাস. তোমার ভাল লাগেনা। আসল কথা হচ্ছে চৌধুরীর কাছ থেকে কোন লোক যদি আসে তাকে পরিষ্কার ভাবে বলে দেবে, আমার কোনো টাকা দেনা নাই। গিয়ে নালিশ কর।

যমুনা দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, না, আমি একথা বলবনা।

তা হলে এখনি কেন বলেছিলে যে আমি যা বলব তাই করবে?

যমুনা আবার বলল, না একথা আমি বলবনা।

না বলবে তো ব'লনা। যা ভাল মনে কর তাই কর। অন্যের ব্যাপারে আমার নাক গলাবার কি দরকার।—বলে অজিত চুপ করে রইল।

বেশ কথা, তুমিও আমাকে মাঝ-দরিয়ায় ছেড়ে দাও। নিজের ঘরের মানুষই যখন বিরূপ, তুমি আর কি করবে?

আমি কি করব?—অজিত বলল, আমি চৌধুরীকে নাকানি-চুবুনী খাইয়ে দিতে পারি তুমি যদি আমার কথামতো কাজ কর। 'আমি একথা বলবনা', এরকম করলে কি কাজ চলে! মতিলালের অভিপ্রায় তোমার ক্ষেত আর কুয়ো তোমার হাতছাড়া হয়ে যাক। গ্রামের ঐ জমিটি খুব ভাল।

দেখি কেমন করে কেউ নেয়। আমি মরে গেলেও ঐ জমি ছাড়বনা।

তুমি না ছাড়লে সরকারী পেয়াদা এসে জমি ছাড়াবে। তুমি আমার কথা এখন শুনছনা, কিন্তু পরে পস্তাবে। আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও। এত টাকা কি চৌধুরীকে তোমার দেয়?

যমুনা মাথা নেড়ে জানাল, না।

বেশ, এই-ই তো কথা, তাকে বলে দাও আমার টাকা দেয় নাই। নালিশ কর।

যমুনা বলল, আমি নতুন করে কাগজ লিখে দেব।

নতুন করে কাগজ লিখে দেবে! জান নতুন কাগজ লিখে দিলে কি হবে? এর পরিণাম হবে হল্লীর গলায় চির দিনের জন্য দড়ি বেঁধে দেওয়া। চৌধুরীর হাতে থাকবে হল্লীর গলার দড়ি। হল্লী বেচারা মার খেয়ে খেয়ে চরবে অন্যের মাঠে, আর দুধ দেবার বেলায় দেবে মতি-লালের বাড়ীতে। মহাজনেরা এঁড়ে বাছুরের দুধ দোয়াবার বিদ্যেও জানে। যত বড় প্রেত হোক আমি তুড়ি মেরে তাড়িয়ে দিতে পারি, যতই না কেন কালসাপ হোক, আমার সামনে কাউকে কামড়াতে পারে না, কিন্তু ঋণদাতাদের কামড়ের চিকিৎসা আমার হাতে নাই।

যমুনা ঘাবড়ে গেল। ছল ছল চোখে সে বলল, আমি কিঁ করি, তুমি কেন কিছু বলছনা?

আমি তো বলছি, কোনো কাগজ-টাগজ লিখে দিয়ো না। নালিশ করতে হয় উনি করুন।

অজিত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এই বিষয়েই যমুনাকে নিজের মতে আনতে চায়। ছাড়া গোরু কোন রকমে কিছুদূর পর্য্যন্ত অন্য গোরুর দলের সঙ্গে

চলেও যায়, কিন্তু যেমনি তাদের গোয়ালের দরজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয় অমনি ভয় পেয়ে ফিরে আসে। যমুনার দশাও হল সেই রকম। সে বলল, ও কথা বলতে পারব না।

অজিত নিজের কপালে হাত দিয়ে বলল, একই কথা কত বার বুঝিয়েছি কিন্তু তোমার মাথায় ঢুকছেনা। কাগজ লিখে দিয়ে তুমি বৃন্দাবন-ভায়ার জমিও বাঁচাতে পারবেনা।

যমুনা বলল, কাগজ-টাগজ-লিখে দেবার বিষয় আমি কি বুঝি?

হ্যাঁ, এই কথা বিবেচকের কথা। চৌধুরী নালিশ তো করুন, তারপর আমি সব দেখে নেব। আদালতে আমি এমন সব প্রশ্ন করব যে বাপ-বাপ বলে কাঁদবে। আজকাল যিনি মুনসিফ সাহেব তিনি খুব ভাল মানুষ। কৃষকদের কথা তিনি চিন্তা করেন। তিনি এবিষয়ে লাট সাহেবকেও ভয় করেন না। আমি তাঁকে তোমার বিষয় সব কথা বলবার পর তিনি যদি তোমার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত না হন, তাহলে বোল। তাঁর বাড়ীতে পূজা, ধর্মকর্ম সবই হয়। উনি খ্রীষ্টান নন। ইংরেজকে স্পর্শ করলে স্নান না করে জলও খান না। আমাকে খুব সম্মান করেন। এই তো সেদিন আদালতেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, অজিত তুমি মন্ত্র-তন্ত্র জানো? আমি বললাম, হ্যাঁ হুজুর জানি। শুনে খুব খুশী হলেন। হাকিম হচ্ছেন, সব দিকের খোঁজ-খবর না রাখলে কাজ কেমন করে চলবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি সব ঠিক করে দেব। মতিলাল আমার কাছ থেকে এক কড়িও আদায় করতে পারবেনা।

যমুনা উঠে দাঁড়াল। অজিতও উঠে বলল, বেশ, আমি আবার এসে আলোচনা করব।

[১৩]

ভিতরের ঘরের দরজায় শিকল দিয়ে যমুনা ক্ষেতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, এমন সময় হল্লী এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, কোথায় যাচ্ছ মা? কিন্তু কোথায়ই বা যাবে, ক্ষেতেই হয়তো যাচ্ছ।

যমুনা সস্নেহে বলল, এখন ছেড়ে দে, নইলে দেরি হয়ে যাবে।

এত দূরে যাবে যে দেরী হয়ে যাবে। দূরে আমি যাব। সেখান থেকে চিঠি লিখলে তুমি পড়তেও পারবেনা যে আমি কি লিখেছি।

বোকার মতন একি কথা বলছিস! ছাড়, এখন যেতে দে।

যাবে তো যাও, আমাকে চারটে পয়সা দিয়ে যাও।

বিস্মিত হয়ে যমুনা জিজ্ঞেস করল, চার পয়সা কিসের জন্য?

বাঁদরওয়ালারা আসছে মা। তাদের সঙ্গে ভালুকও আছে। বাঁদরের খেলার জন্য দু-পয়সা, আর দু-পয়সা ভালুকের খেলার জন্য। আমি এখনি তাদের ডেকে আনছি, তুমিও খেলা দেখে তারপর যেয়ো। খুব ভাল খেলা। হীরা দু-আনা দিয়েছিল, আমি এক আনা দিলেই হবে।

খেলা দেখবার জন্য আমার কাছে পয়সা নেই, বলে যমুনা যাবার জন্য এগোল।

মায়ের শাড়ীর আঁচল ধরে সঙ্গে সঙ্গে যেতে যেতে হল্লী বলল, শোন মা, খুব ভাল খেলা। দেখে তুমি হেসে হেসে গড়া-গড়ি দেবে। একটা বাঁদর মাথায় লাল টুপি পরে হাতে লাঠি নিয়ে নিজের স্ত্রীকে আনতে যায়। স্ত্রী রেগে ওঠে, আসতে চায়না। তখন ঐ বাঁদরটা লাঠি মারার ভয় দেখিয়ে তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসে। কেমন ভাল খেলা। পয়সা দিয়ে খেলা দেখলে বাঁদরওয়ালাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হবে। তারা অনেক দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়।

হল্লী বার বার কোথাও যাবার কথা বলে, এই সময় আবার ওর কাছে এই রকমের কথা শুনে যমুনা চিন্তিত হয়ে উঠল। বলল, সাবধান, যদি ওদের সঙ্গে মেলা-মেশা করিস! ওরা লোক ভাল নয়। একবার তো খেলা দেখেছিস, আর দেখবার দরকার নেই।

হীরাও তো দেখেছিল—

সে বড় লোকের ছেলে। সব বিষয় তার সঙ্গে সমান তালে তুই চলতে পারিসনা—বলে যমুনা ক্ষেতে চলে গেল।

মুখ ভার করে হল্লী সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। হীরালাল বড় লোকের ছেলে, কিন্তু তার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের কি আছে, এটা সে বুঝতে পারেনা। সে জানে যে লেখা-পড়ায় আর খেলা-ধুলায় সে তার চেয়ে

শ্রেষ্ঠ। হীরা দু-আনা দিয়ে খেলা দেখেছে, সে কিন্তু এক আনা দিয়েই দেখতে পারে। তবু মা কেন হীরার পক্ষ নেন সব বিষয়ে, এই ভেবে তার মন দমে গেল। পাশের গলি-পথ থেকে বাঁদর ওয়ালাদের ডুগ্-ডুগির শব্দ ওখান পর্যন্ত আসছে। এতে তার মন আরও খারাপ হচ্ছিল। সে স্থির করল, আজ সে ভাল করে খাওয়া-দাওয়াও করবেনা। বলবে, হীরাকে ডেকে তাকেই ভাল করে খাওয়াও-দাওয়াও, আমি খাবনা! একবার সে এও ভেবেছিল যে বাঁদরওয়ালাদের সঙ্গে কোথাও চলে যাবে, তখন মা কেঁদে কেঁদে অনুতাপ করবে। কিন্তু যেহেতু মা বাঁদরওয়ালা-দের সঙ্গে মাখা-মাখি করতে বারণ করে দিয়েছিলেন, তাই তাদের সঙ্গে যাবার কল্পনা তার মনে বেশিক্ষণ রইলনা।

চার-পাঁচ দিন পরে স্কুল হতে ছুটতে ছুটতে হল্লী এসে সোজা রান্না ঘরে ঢুকে পড়ল। উনুনের কাছ থেকে ব্যস্ত হয়ে যমুনা বলল, একি, পা ধুয়ে আয়।

হল্লী এই সময় খুব ভাল খবর এনেছে। সেই খবর মাকে তাড়া-তাড়ি শোনাতে এসেছে। সে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেই খানেই দাঁড়িয়ে রইল। পেছিয়ে গেলনা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আমার টাকা পাওয়া গেছে।

যমুনা উৎসুক হয়ে বললে, পাওয়া গেছে? কোথায় পেলি?

হল্লী বললে, এখনো আমার হাতে আসেনি, হীরা চুরি করেছিল।

যমুনার সব ঔৎসুক্য দমে গেল, এটা হল্লীর কাছে গোপন রইল না। সে বলল, মা চিন্তা ক'রনা, টাকা পাওয়া যাবে। পণ্ডিত মশায় বলেছেন।

যেন হল্লীর কথা শোনেনি এমন ভাবে যমুনা বলল, তাড়াতাড়ি চান সেরে আয়, দেরি হয়ে গেছে। না, তুই দাঁড়া; হাত ধুয়ে আমিই তোকে রোদ্দুরে বসিয়ে ভাল করে চান করিয়ে দেব।

মায়ের এই ভাবের কোন অর্থ হল্লী বুঝতে পারলে না। সে ভাবল, আমি টাকা ফিরে পাবার এত বড় গোয়েন্দার কাজ করে এসেছি, কিন্তু আমার কথা যেন মায়ের কানেই ঢোকেনি। ক্রমাগত বাবার কথা ভেবে ভেবে এঁর স্বভাব যেন কেমন হয়ে গেছে! সে আবার বলল, পণ্ডিতমশায়

আজ হীরাকে খুব শায়েস্তা করেছেন। উনি ওকে বলেছেন—বাড়ী হতে টাকা এনে দে, নইলে স্কুল থেকে বের করে দেব।

যমুনা বলল, না, সে টাকা চুরি করেনি। তুই নিজের জিনিস সামলে রাখতে পারিসনা আর অন্যকে চুরির দোষ দিস। পণ্ডিত-মশায়কে বলে দিস তিনি যেন ওকে কষ্ট না দেন। দাঁড়িয়ে আছিস যে, তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়, আমি চান করিয়ে দিচ্ছি।

এতক্ষণ পরে হল্লী বুঝতে পারলে যে হীরালাল বড় লোকের ছেলে, এই জন্যই মায়ের বিচারে সে চুরি করতে পারেনা। টাকা পাওয়া যাবে বলে হল্লী তত খুশী হয়নি, যত খুশী হয়েছিল এই ভেবে যে এইবার মা ভাল করে হীরালালকে চিনতে পারবেন। এই আনন্দেই সে ঠাণ্ডা জায়গায় বসেই দুঘণ্টা ধরেও মাটির কলসীর বাসী জলেও চান করতে পারত। কিন্তু মায়ের মাথায় কিছু ঢোকেই না। পণ্ডিতমশায় পর্যন্ত বিশ্বাস করেছেন—অথচ মা বলছেন হীরা চুরি করেনি।

রেগে হল্লী বলল, হীরা চুরি করেনি তো কি আমি চুরি করেছি?

তুই আমার টাকা কেন চুরি করবি, যমুনা হেসে বলল, কিন্তু পরক্ষণেই অদ্ভুত কঠোরতা তার মুখে দেখা দিল, বলল, যেদিন দেখব তুই চুরি করেছিস সেই দিন বুঝতে পারব তুই আমার ছেলে কিনা।

হল্লী চুপ করে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। মায়ের এই কথা তার ভালই লাগল! এই জন্যই কি যে, এই ব্যাপারে সে হীরালালকে খুব ঘৃণার চক্ষে দেখতে পারে? অথবা এই জন্যই কি যে, মায়ের এই কথায় তার প্রতি মায়ের স্নেহই যথেষ্ট পরিস্ফুট? ঠিক করে বলা শক্ত কেন হল্লী খুশী হল। হতে পারে, ঘৃণা আর ভক্তির দুই বিরোধী ভাব অজ্ঞাতসারে তার মনে জেগেছে, পূর্ব আর পশ্চিমে চন্দ্রমা আর সূর্যের মতো একই সঙ্গে।

তবু এই সময় ক্রোধের ভাবই হল্লীর মনে প্রবল হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ পরে সে বলে উঠল, তুমি চোরের পক্ষ নিচ্ছ। আমি আমার টাকা আদায় না করে ছাড়বনা।

যমুনা বলল, তুই এই মনে কর যে টাকা হারিয়ে গেছে। যা হারিয়ে যায়, বুঝতে হবে সেটা আমার ছিল না।

এই কথা উচ্চারণ করামাত্র তার মনে হল যে তারও কিছু হারিয়ে গেছে। তার সেই হারিয়ে-যাওয়া ধন যদি আবার ফিরে আসে তাহলে কি সে তা নিতে চাইবেনা ?

হল্লী বলল, আমার মনে হয়েছিল যে আমার টাকা চুরি করেছে, সেই টাকা তার শ্মশানে গেছে। কিন্তু এখন আর আমি কারও কথা শুনবনা—

নিজের ধন তিন থাপ্পড় মেরে
বেপরোয়া—নেব কেড়ে।

হল্লী এই ছড়া আওড়ে দিল।

যমুনা এই মাত্র নিজের স্বামীর কথা স্মরণ করছিল, তার পরই এই সময়েই তার কানে গেল শ্মশানের কথা। সে সঙ্গে সঙ্গে রেগে বলল, খারাপ ছেলেদের কাছে কি সব খারাপ কথা শিখেছিস। দাঁড়া, দেখাচ্ছি।

মায়ের এই ক্রোধ দেখেও হল্লী সেখান থেকে নড়ল না। তখনো হীরালালের প্রতি তার বিদ্বেষ ছিল উগ্র। তার পণ্ডিতমশায়ও বলে ছিলেন যে তার টাকা যেন তাকে দেওয়া হয়। তবু যদি হীরা না দেয় তাহলে মারধোর করে আদায় করে নেবে। জমিদারদের লোকেরা জোর-জুলুম করে চাষীদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে। এটা সে বার বার লক্ষ্য করেছে। সে কেন কারও প্রতি দয়া করবে ? মায়ের বুদ্ধি যেন কেমন হয়ে গেছে।

কোন রকমে স্নান সেরে হল্লী খেতে বসল। তবু থেকে থেকে ঐ আলোচনাই করছে। কেমন করে চুরির এই ব্যাপার প্রকাশ পেল তা বলল। অন্য একটি ছেলের সহযোগিতায় হীরা চুরি করেছিল। কোন বিষয় নিয়ে ঐ দু-জনের মধ্যে ঝগড়া বাধার ব্যাপারটার রহস্য ধরা পড়ল। যে চোর সে একদিন না একদিন জেলে যাবেই। পণ্ডিতমশায় জিজ্ঞেস করায় ঐ অন্য ছেলেটি সব কথা খুলে বলল। সেদিন হল্লী পেন্সিল বার করবার জন্য পকেট হতে বাজে জিনিষ বার করে নিচে একটি বইয়ের উপরে রেখেছিল, সেই সঙ্গে টাকাও ঐখানে রেখে দিয়েছিল। ঠিক ঐ সময়েই কোন কাজের জন্য পণ্ডিতমশায় তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গেই সে ওখান থেকে চলে গিয়েছিল। সুযোগ-সুবিধা

দেখে ঐ ছেলেটি হীরার সঙ্গে জুটে ওখান থেকে টাকা তুলে নিলে। তারপর দু-জনে মিলে ময়রার দোকানে গিয়ে খুব মিষ্টি-টিষ্টি খেলে, বাজার থেকে পেন্সিল কাটবার গোল চাকু আর রবার লাগান হোল্ডার কিনল, আরও কত বাজে খরচ করে টাকা শেষ করে দিল। এখন সব টাকা হীরাকেই দিতে হবে, একথাও পণ্ডিতমশায় বলেছেন। বড় লোকের ছেলের বড় রকমের শাস্তিই পাওয়া উচিত। বাছা স্কুলে তো পিটুনি খেয়েইছে, বাড়ীতে গিয়েও যখন তাকে উত্তম-মধ্যম দেওয়া হবে তখন বুঝবে কু কর্মের ফল এই রকমই হয়।

এই সব কথা শুনে যমুনারও রাগ হল। তবু সেই রাগ প্রকাশ করলনা, চুপ করে রইল। মায়ের এই নীরবতা হল্লীর ভাল লাগল না।

[১৪]

রবিবারের দিন—ছুটির দিন। ছ-দিন নিরন্তর ছেলেদের নিজের পেছনে দৌড় করিয়ে অল্পক্ষণের জন্য সময়টা যখন ছেলেদের কাছে বসে। এটা সেই-ই দিন, বাজে জিনিসের গাদাখানেক জিনিসের মধ্যে যেন এই দিনই তাদের কাজের জিনিস।

কিন্তু হল্লীর মনে হল আজ রবিবার না হলেই ছিল ভাল। যেন এই রবিবার ষড়যন্ত্র করে তার চুরি যাওয়া টাকা আরও একদিন পরে ফেরৎ দেবার সুযোগ দিল হীরালালকে। তার এই কুকার্যের সঙ্গে অসহযোগ করবার জন্য আজকের রবিবারে স্কুল খোলা থাকাই সঙ্গত হত।

তবু, খিদে না পেলেও যদি কোন মিষ্টি ফল সুগন্ধ ছড়িয়ে হাতে এসে পড়ে তার সদ্ব্যবহার না করে থাকা যায় না। হল্লী স্থির করল আজকের দিনের সদ্ব্যবহার করবে বাইরে ক্ষেতে ছেলেদের সঙ্গে। নিজের ক্ষেতের আম গাছে মুকুল ধরেছে এ খবর সে আজ শুনেছে, কাজেই মুকুল দেখবার জন্য সেখানে তার যাওয়া আবশ্যক।

সে মাকে বলল, মা, তুমি স্কুলের পণ্ডিত মশায়ের চেয়েও কড়া। স্কুলের তো ছুটি আজ, কিন্তু তুমি আজকেও আমাকে চান না করিয়ে

ছাড়বে না, আমি চান করে আসছি, তুমি আমার জন্য খাবার বেড়ে রাখ। নইলে দেরী হ'য়ে যাবে, আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

তাড়াতাড়ি কোথায় যেতে হবে, যমুনা জিজ্ঞেস করল।

খেলা করতে যাব, বোম্বাই কিম্বা কলকাতায় কি আর যাব? তুমি তো কখনো আমাকে বাইরে যেতে দাওনা, আমার কিন্তু খুব যেতে ইচ্ছে করে। একবার তুমি আমাকে দশ টাকা দাও, তা হলে দেখবে আমিও বাবার মতন দেশে বিদেশে বেড়াতে পারি কিনা।

রাত্রি-ভোজনের পূর্ব সময় পর্যন্ত নিশ্চিত হয়ে হল্লী নিজের দলের সঙ্গে ক্ষেতের সেই আম গাছের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। নতুন-নতুন পাতায় ভরা গাছ বেশ সুন্দর হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাহ্য সৌন্দর্য্যের প্রতি ছেলেদের আগ্রহ আকর্ষণ ছিলনা, তাদের আগ্রহ ছিল সবুজ-সবুজ পাতার আড়ালে কোথায় কোথায় কাব্যের মর্মের মতন মুকুল লুকিয়ে আছে তাই দেখবার। একটি ছেলে বলে উঠল, ঐ যে—ঐ যে!

অন্য একটি ছেলে মাটি থেকে একটা ঢেলা তুলে উপরের দিকে ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলল, এই দিকে চেয়ে দেখ আর একটা?

হল্লী উপরের দিকে না তাকিয়েই ছেলেটিকে ধাক্কা দিয়ে বলল, কি করছিস? মুকুলে আম ধরে, ঢেলা লাগলে নষ্ট হয়ে যাবে।

তখন একটি ছেলে প্রস্তাব করল, সে গাছে উঠে উপর থেকে বলে দেবে কোথায়-কোথায় মুকুল ধরেছে। বিচার-বিবেচনার পর ছেলেরা তার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল। উপরে উঠলে পড়ে যাবার ভয় আছে এই ভেবে অগ্রাহ্য করেনি, অগ্রাহ্য করল এই চিন্তা করে যে গাছের ডাল সরু, কোন ডাল ভেঙে গেলে ক্ষতি হবে। কিন্তু আরও কিছুক্ষণ দেখার পর গাছে না উঠেই তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হল। তারা যা দেখতে চাচ্ছিল। নিচের থেকেই সেগুলি প্রচুর সংখ্যায় দেখতে পেল।

আনন্দের সঙ্গে হাততালি দিয়ে দিয়ে হল্লী বলতে লাগল, এত মুকুল হয়েছে, সব মুকুলেই যদি আম ধরে কেমন মজা হবে।

এত আম হবে যে গাঁয়ের সব লোক বসে খেয়েও শেষ করতে পারবে না।

হল্লীর পক্ষে এটা বড়ই আনন্দের বিষয় যে তার গাছের আম গ্রামের সকলেই খাক। কিন্তু সে বলল, আমি গ্রামের সকলকেই খেতে ডাকবনা—ডাকলে সকলের সঙ্গে হীরাও এসে জুটবে।

দলের একটি ছেলে বলল, হীরা চোর। সঙ্গে সঙ্গে অন্য ছেলেরাও চেঁচিয়ে বলে উঠল,—চোর চোর, যেন সতি-সত্যিই তারা কোন চোরকে চুরি করবার সময় ধরে ফেলেছে।

একটি ছেলে বলল, তার একটা কথা শুনেছ হল্লী? সে বলে তোমার মায়ের কাছে তার অনেক টাকা প্রাপ্য আছে। দু-টাকা নিয়েছি তো অন্যের কি ক্ষতি হয়েছে। সব টাকা তিনি না দিলে ভগবানের কাছে তাঁর বিচার হবে।

আর একটি ছেলে বলল, হল্লীর মা টাকা ধার নেন নি। কে কে সাক্ষী আছে বল?

কিছুক্ষণের জন্য হল্লী অন্যমনস্ক হয়ে গেল। হীরা তো একথা মিথ্যে বলেনি। সে নিজের মায়ের কাছে শুনেছে যে চৌধুরীর কাছে তাঁর কিছু দেনা আছে। এই জন্যেই কি চুরির কথা শুনেও মা হীরার প্রতি বিরক্ত হন না? সে বললে, হীরার বাপের কাছে আমাদের কিছু টাকা দেনা আছে, কিন্তু সে কেন চুরি করলে? এর জন্য ভগবানের কাছে তাকে নরক-শাস্তি পেতে হবে।

হল্লীর এই সিদ্ধান্তে সব ছেলেরাই খুশী হল। তাদের এই প্রসন্নতা দেখে বিরোধীরাও একথা বলতে পারেনা যে বিধাতা নরক স্থষ্টি করে কোনো মন্দ কাজ করেছেন।

একজন বলল, হীরা একথাও বলেছিল যে—প্রাপ্য টাকার জন্য হল্লীর এই ক্ষেত, এই কূপ আর আমের এই গাছ কেড়ে নেবে। এই ক্ষেত, তার বাপের অধিকারে গেলে সে তখন অন্য কাউকে এর একটিও ফলের ঘ্রাণও নিতে দেবেনা।

সে আম না দিলে তার সব আম পচে যাবে। কোন একজন মানুষ এত গুলি আম খেতে পারে,—কি বল হল্লী?

হল্লী যেন একথা শুনেও শুনতে পায়নি। তার গাছ হীরালাল নিয়ে নেবে এই দুশ্চিন্তায় তার মুখ শুকিয়ে গেল। সে জানে তার মা এই গাছকে কত ভালবাসেন।

কেউ এই গাছের একটি পাতা ছিঁড়লেও তাঁর দুঃখ হয়, কষ্ট হয়। গাছের তলা এমন করে পরিষ্কার করে রাখেন যেন রান্না ঘর পরিষ্কার করেছেন। তার মনে আছে, গত বছরে এই সময়েই তিনি নিজের হাতে কলসীর পর কলসী জল তুলে সেই গাছের গোড়ায় ঢালছিলেন। কোন একজন বলেছিল যখন আম-গাছে মুকুল ধরবার সময় হয় তখন তার গোড়ায় জল দিতে নাই। জল দিলে মুকুল ঝ'রে যায় আর আমও হয়না। এই কথা শুনে মা বলেছিলেন, গরম পড়তে শুরু হয়েছে আর আমার এই গাছটি এখনো শিশু চারাগাছ, সে জল না খেয়ে কেমন করে থাকবে। আম ধরুক আর না ধরুক। তার আরও মনে পড়ে গেল একদিন মা বলেছিলেন, হল্লী, এই গাছটি তোর বড় ভাই। দেখ কত ভাল, আর তুই এর নিচে হৈ-হল্লা করিস? গাছটিকে নিজের বড় ভাই ভেবে হল্লীর মনে খুব আনন্দ হয়েছিল। তার মনে হচ্ছিল গাছটিকে জড়িয়ে ধরে। কবি অনেক দিন পূর্বে কোন এই রকম গাছ দেখে হয়তো বলেছিলেন ঘটস্তনপ্রস্রবণৈর্ব্যবর্ধয়ৎ। হল্লী একথা জানত না, তবু গাছের প্রতি মায়ের পুত্র-বাৎসল্যকে সে বুঝতে পারে। তা স্বীকার করে হৃদয় দিয়ে। তার বাবা বাড়ী আসেন না আর তার এই বড় ভাইও আর থাকবে না, এই ভেবে হল্লীর চোখে জল এল॥

ফাল্গুনের শেষ শুরু হয়েছে। চারিদিকের ক্ষেতে ফসল কাটা শেষ হয়েছে। এখানে-ওখানে ক্ষেতে কাটা ফসলের গাদা জড়ো হয়ে আছে। কৃষকেরা কোথাও বলদের মুখে জাল্ পরিয়ে ফসল মড়াই করছে, আর কোথাও বা মড়াই করা ফসলের ভুষি হাওয়ায় উড়ছে। স্থানে-স্থানে কৃষকদের ছেলে-পিলেরা গাছের ছায়ার তলায় খেলায় ব্যস্ত। তবুও হল্লীর মনে হচ্ছে যেন কোথাও কেউ নাই; দূর-দূর পর্যন্ত সমস্ত ক্ষেতের সম্পদ কেউ যেন লুঠ করে ক্ষেতগুলিকে ফাঁকা করে দিয়েছে।

একটি ছেলে বলল, হল্লী তুমি এতই বিমর্ষ হয়ে পড়ছ যেন সত্য-সত্যই হীরা তোমার সব কিছু কেড়ে নিয়েছে। সে এখানে এলে আমরা সবাই মিলে তাকে মেরে তাড়িয়ে দেব। চল আবার চোর-চোর খেলা করি।

হল্লী উৎসাহিত হয়ে বলল, বেশ তাই করা যাক।

এইবার খেলা-সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হল। হল্লী কোতোয়াল হয়ে বসল। শুকনো পাতার ডাঁটা দিয়ে নিজের জন্য একটি কলমও তৈরী করে নিল। আর কিছু না হোক কোতোয়ালের হাতে এটা থাকা চাই-ই। সে এমন ভাবে সোজা হয়ে বসল যেন তার সামনে একটা টেবিলও পাতা আছে। কোতোয়াল সাজার বিষয় আর কোন ত্রুটিই রইল না। চৌকিদার হবার জন্য দু-চারটি ছেলে আনন্দের সঙ্গেই প্রস্তুত হল। বাকী রইল চোরের পার্ট। খেলাতেও চোর পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। সব চেয়ে যাকে বুদ্ধিহীন বলে সবাই মনে করে, তাকেই অনুরোধ করা হল চোর সাজতে। সে রাজী হলনা। বলল, চৌকিদার বেদম মার দেবে।

হল্লী বলল, যে চুরি করবে সে মার খাবেনা তো কি হয়? কিন্তু একটা কথা, চুরি করার জন্য তো টাকার দরকার।

অন্য একটি ছেলে বলল, চোর আমের পাতা চুরি করবে। চৌকিদার এসে বলবে হুজুর—

তার কথা শেষ না হতেই হল্লী বললে, না, আমের পাতা কিছুতেই ছেঁড়া চলবে না। গাছে মুকুল ধরেছে।

না চোর, না তো চুরি করবার জন্য টাকা, এমন অবস্থায় কোতোয়াল আর চৌকিদারদের কাজ কেমন করে চলবে? ঠিক এই সময় একটি ছেলে বলে উঠল, ঐ দেখ, হীরা আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হীরালাল তাদের কাছে এসে উপস্থিত হল। হল্লী কোতোয়াল হয়ে বসে আছে, এই সময় তার প্রয়োজন চোরের। কাজেই হল্লী হীরাকে ক্ষেতে আসতে বাধা দিতে পারল না।

হীরা চট করে সামনে এসে বলল, চোর-চোর খেলা করছ? বেশ আমি চোর সাজব।

সকলেই বিস্মিত হল। হল্লীর সঙ্গে তার এত ঝগড়া তবু তার ক্ষেতে এসে তার সঙ্গে খেলা করতে হীরার লজ্জা করে না। কিন্তু সত্যিই তার এই ব্যবহারে হল্লীর মনে আনন্দ হল। যেমন ঝাল হলেও লঙ্কায় কিছু স্বাদ থাকে, যা আমাদের রসনাকে তৃপ্ত না করে পারে না।

একটি ছেলে বলল, বিজু বলছিল সে চোর সাজবে না, চৌকিদার খুব ঠ্যাঙাবে।

হীরালাল বলল, ও তো বিজুই, চুরি করার ও কি জানে। চৌকিদার হোক, কোতোয়াল হোক, উকিল হোক, সকলের চোখে ধুলো দিয়েই যদি না যেতে পারে তবে আর বাহাদুরী কিসের।

হল্লী বলল, চুরি করার আবার বাহাদুরী কিসের? তুমি চুরি করেছিলে এবং একদিন ধরাও পড়েছিলে। কাল যদি এসে টাকা না দাও তাহলে পণ্ডিতমশায়…

পণ্ডিতমশায়কে দেখা আছে। তুমি নিতান্ত ভাল মানুষ তাই তোমাকে শিক্ষা দেবার জন্যই আমি ঐ কাজ করেছিলাম। আমাদের অভাব কিসের? আমাদের বাড়ীতে অনেক টাকা আসে। দুই টাকার জন্য তুমি এমন কাতর হবে এটা আমি বুঝিনি। আমার বাড়ীতে কত টাকা নর্দমায় ভেসে যায়, যখন বলবে তখনি দশ-বিশ-পঞ্চাশ টাকা এনে দিতে পারি। তোমার মায়ের কাছেও আমরা অনেক টাকা পাই। আমাদের অভাব কিসের।

হীরার এই কথায় হল্লীর লজ্জা বোধ হল। সে ভাবল সত্যই তো এটা খুবই খারাপ যে দু-টাকার জন্য সে এত অধীর হয়ে উঠেছিল। এই কারণেই মা ঐ টাকার জন্য কিছু মনে করেন নি। সব চেয়ে অধিক লজ্জার বিষয় যে হীরার কাছে মায়ের অনেক টাকা দেয় আছে। সে ঐ প্রসঙ্গ ছেড়ে বলল—তুমি আমাকে কি পাঠ শেখাবে, ক্লাশে সকলের চেয়ে বেশি মার খাও তুমি।

যারা খেলা করতে চাচ্ছিল এসব কথা তাদের ভাল লাগছিল না। চোর উপস্থিত অথচ কাজের কাজ হবে না। এ কেমন ব্যাপার? চটৃ-পটৃ খেলা আরম্ভ হল।

কথা ছিল চুরি করার খেলা হবে, কিন্তু হীরা সত্যি-সত্যিই চুরি করতে লাগল। এক দিকে আমের কতগুলি পাতা খুব উঁচুতে ছিল না। হাতে একটা ছড়ি নিয়ে চোর লাফ দিয়ে দিয়ে এক গোছা পাতা পাড়তে লাগল; হল্লী, দূর থেকে তাকে ঐ কাজে বাধা দেবার জন্য চেষ্টা করতে যাচ্ছিল, ততক্ষণে গাছের একটি ছোট্ট ডাল ভেঙে তার হাতে এসে পড়ল।

হল্লী রেগে উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করে বলল, ধর-ধর, বেইমান চোরকে। ডাকাতি করে পালাচ্ছে!

উত্তেজনার বশে হল্লী ভুলে গিয়েছিল যে তার পদ কোতোয়ালের, সাধারণ চৌকিদারের মতন চোরের পিছনে পিছনে ছুটে যাওয়া তার কাজ নয়। সে ছুটল, চৌকিদাররাও ছুটল আর সাধারণ নাগরিকদের মতো অন্য সব ছেলেরাও চৌকিদারদের এই ব্যাপারে সাহায্য করতে পিছপা হল না। চোর আর পুলিশের মধ্যে প্রবল কে এটা বলা খুব সহজ নয়। কিন্তু বলতেই হবে যে এই সময় এদের মধ্যে চোরই প্রবল ছিল। দেখা গেল সে চোরাই-করা মাল নিয়ে সে দূরে জোরে দৌড়ে পালাচ্ছে।

যদি সত্যিই কোতোয়ালের পদের কথা এই সময় হল্লীর মনে থাকত তাহলে খুব সম্ভবত, এই নকল পুলিশের হাতে ঐ চোর ধরা পড়ত না। কিন্তু খেলাধূলার কথা ভুলে হল্লী হীরার পিছনে এমন করে ধাওয়া করল যে অল্প দূরে গিয়েই সে চোরের একটা হাত ধরে ফেলল এবং তার পিঠে এক কিল বসিয়ে দিল।

চোরাই-করা জিনিস যে হাতে ছিল হীরালাল সেই হাত দিয়েই হল্লীকে ঠেলে ফেলে দিলে পাশের একটা কাঁটা ঝোঁপের মধ্যে। এদিকে হল্লী কাঁটার ঝোঁপ থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করছে আর ওদিকে হীরা গালি-গালাজ দিতে দিতে পালাচ্ছে।

পাশেই পড়েছিল একটা পাথর, হল্লী সেই পাথর হাতে তুলে নিয়ে বলল, পালাসনে, পালালে মেরে ফেলব।

এই কথার উত্তরে আবার হল্লীর কানে হীরার গালি-গালাজ আসতেই সে তার হাতের পাথরটা হীরাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়েই মারল।

আশে-পাশের ছেলেরা লক্ষ্য করল হীরালাল মাটিতে পড়ে আছে। সকলে চেঁচিয়ে উঠল,—হল্লী, এ কী করলি?

হল্লী চায়নি যে সে এমন একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড করবে। কিন্তু এখন কি করা যায়। সে হীরার দিকে না তাকিয়েই অন্যদিকে ছুটে পালাল। অন্য ছেলেরাও পালাতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই সেখানে পূর্ব্বের মতন নির্জনতা ছেয়ে গেল।

[১৫]

খেয়ে-দেয়ে হল্লী চলে যাবার পর যমুনার আলস্য বোধ হল। সব সময় নানা কাজে ব্যস্ত থাকলেও, জাগরণের মধ্যেও সুষুপ্তির মতো একটা গূঢ় বেদনাকে সে প্রচ্ছন্ন ভাবে ধরে রাখে। কবে কোন অজ্ঞাতের স্পর্শে তা জেগে উঠবে, তার কোন সম্ভাবনা ছিলনা। মাঝে মাঝে সে নিজে যাচাই করে নিতে চায় যে তার এই বেদনা শান্ত তো হয়ে যায়নি। এমন একটা অবস্থা হয় যখন বৈদ্য জেনে-বুঝেও রোগীর দেহে জ্বরের তাপ বজায় রাখার ব্যবস্থা করেন। যমুনার ঐ বেদনাও এই রকমেরই তার জীবনের নিধি-স্বরূপ ছিল। এরি সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ-প্রবাহ বিদেশে-চলে-যাওয়া স্বামীর সঙ্গে তার সম্বন্ধকে অবিচ্ছিন্ন রাখত। সহসা আলস্য বোধ হওয়ায় সে নিজেকে এই ভেবে প্রবোধ দিতে চাইল যে তার শরীর ভাল নাই। অন্ধকার কুঠরীর মধ্যে গিয়ে চুপ-চাপ শুয়ে রইল।

সন্ধ্যায় বাইরে গোরুর হাম্বা রবের শব্দ শুনে সে চমকে উঠল। ভাবল সে এই বাড়ীর কর্ত্রী, এমন করে কি আলস্যে দিন কাটান উচিত। পাড়ার স্ত্রী লোকেরা হয়ত দেখে গেছে যে দিনের বেলাতেও আমি ঘুমাচ্ছি; হয়ত বলা-বলি করছে, নিষ্কর্ম্মা রানী মহারানীর মতো শুয়ে আরাম করছি! ভালই হল; হল্লী এসে দেখেনি।

যমুনা ঐ সময় এমন ভাবে ব্যস্ত হয়ে ঘরের কাজ-কর্ম করতে লাগল যেন তার এতক্ষণ ধরে শুয়ে থাকার জন্য, সব কিছু বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে।

ঘণ্টা-দেড় পরে এক হাতে ফেনা-ভরা দুধের পাত্র আর অন্য হাতে প্রদীপ নিয়ে, সে রান্না ঘরের দিকে যাচ্ছিল। যেতে যেতে দেখতে পেল উঠানের রোয়াকে হল্লীর পুস্তকাদির ব্যাগ। ব্যাগ দেখে তার মনে হল হল্লী এখনো ফেরে নি। অনেক দেরী হয়ে গেছে। এই কথা মনে পড়তেই তার বুক ছ্যাঁক করে উঠল। আজ খেলা করতে যাবার

আগে হল্লী বলেছিল দেশে-বিদেশে বেড়িয়ে আসতে আমার খুব ইচ্ছে হয়। যমুনা ভাবল আমি কেন তাকে তখনি ধমকে দেইনি। এই সব কল্পনা করতে করতে বড় হয়ে কি আর সে বাড়ীতে থাকতে পারবে? সেও যদি আমাকে ছেড়ে যায় তাহলে আমি বাঁচব কি করে? এই রকমের ভয় যমুনার কাছে নূতন নয়। ঘরে কোথাও এখানে-ওখানে ইঁদুরের গর্তকে সাপের গর্ত মনে করার ভীতি তার গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু এতক্ষণেও হল্লী ফিরে না আসায় সে খুব চিন্তিত হয়েই তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

গলির মোড়েই দূরে রাধের দেখা পেল। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, হল্লী কোথায় আছে ভাই?

কোথায় আছে জানি না কাকী! বিজুকে জিজ্ঞেস কর। আমি কিছুই জানি না,—বলে দূর হতেই রাধে তৎক্ষণাৎ পালিয়ে গেল।

যমুনার কণ্ঠ-স্বর শুনে পাশের বাড়ী থেকে বিজয়রামের দিদিমা বেরিয়ে এসে বলল, ওরে যমুনা, তোর নিজের ছেলের কাণ্ড শুনেছিস? আমি কতবার বলেছি, আদরের বাড়া-বাড়ি ঠিক নয়, ছেলে খারাপ হয়ে যায়। এখন তাই হল কিনা? অনেক ছেলে দেখেছি কিন্তু এমন দুরন্ত দেখিনি। সারাদিন দুষ্টুমি করে বেড়ায়। আমার কথা যদি শুনতিস—

মাসী, হয়েছে কী?

হয়েছে কী! গোটা পৃথিবী যা জানে, সেটা জাননা ভান করে তুমি গোপন রাখবে? আমি আগেই বলেছিলাম। বলেছিলাম কিনা, পাড়ার সকলেই জানে। তুমি অস্বীকার করলে কি হবে?

কিছু দূরে বিজয়কে দেখে যমুনা ডেকে বলল, শোন তো ভাই বিজয়রাম।

যমুনা তাকে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই মাসী বলে উঠল, আমার কথা তো শুনছ না—

মাসী, তুমি কিছু বললে তো হয়।

মাসী এই প্রসঙ্গে নিজের কথা বলবার সুযোগ ছাড়লেন না। বললেন, বলছিস কিছু বলতে। বলি আর কেমন করে? আমি কি বলিনি, হল্লী হীরাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে জখম করে দিয়েছে।

বিজয় যেখানে ছিল সেইখানে দাঁড়িয়েই প্রতিবাদ করে বললে, হল্লীর বিরুদ্ধে কেন মিথ্যে কথা বলছ দিদিমা? এখনি তো হীরার সঙ্গে খেলা করে আসছি। হল্লী তার গায়ে পাথর ছুঁড়েছিল মাত্র, সে জখম হয়নি।

যমুনা স্বস্তি বোধ করল। বলল, হল্লী কোথায়? দেখ, আমি তাকে ঢিট করি কিনা।

আমি জানি না। অনেকক্ষণ তাকে দেখি নি। হীরা চুরি করে পালাচ্ছিল।

আবার সেই চুরির প্রসঙ্গ! যমুনা তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলল। ভাবল হয়ত ভয়ে সে কোন জায়গায় লুকিয়ে আছে, আজ বেশ করে তার কান না ডলে ছাড়বনা।

যমুনা এই রকম ভাবল বটে, কিন্তু যখন পরিচিত কোন জায়গায় হল্লীকে পাওয়া গেলনা তখন মনে মনেই বলতে লাগল, ওরে ফিরে আয়, ফিরে আয় বাছা, আমি মারব না। বাছা আমার, তুইও কি আমাকে পরিত্যাগ করবি?

সে, অজিত আর পাড়ার লোকেরা লণ্ঠন নিয়ে অনেক খোঁজা-খুঁজি করল তবুও কোথাও হল্লীর সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেই সারা রাত্রি কেমন করে যমুনার কেটেছিল তা যমুনার অন্তর্যামীই জানেন।

[১৬]

খুব ভোরেই হল্লীর সঙ্গী আর সহপাঠীরা আবার তার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। খেলা করবার সময় গ্রামের যে-সব জায়গায় সে লুকিয়ে থাকত তারা সে-সব জায়গায়ও দেখে এল; গাঁয়ের বাইরে লুকিয়ে থাকার মতন যত ঝোঁপ-ঝাড় ছিল সে সবগুলি তন্ন তন্ন করে দেখল। একটা জনহীন স্থানে পুরাতন একটা বাগান বাড়ী ছিল, সেখানে ভূত আছে এই প্রচলিত ভয় বিসর্জন দিয়ে সেখানেও খুঁজল, যেখানে খোঁজ করা নিরর্থক সেখানেও খুঁজল, তবু কোথাও কারও

দৃষ্টিতে হল্লীর ছায়া পর্যন্ত দেখা দিলনা। একটি ছেলে বলল, লুকিয়ে থাকার জন্য একবার হল্লী একটা গাছে উঠে বসেছিল। কেউ যখন তাকে খুঁজে বার করতে পারেনি, তখন সে নিজেই গাছ থেকে নেমে এসে বলেছিল, আমি এমন জায়গা বেছে নিয়েছিলাম যেখানে চার দিন পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে পারতাম তবুও নিচে যারা ছিল তারা টেরও পেতনা কোথায় আছি।

সেইখানেই হয়তো আছে, বলে কয়েকটি ছেলে এক সঙ্গে সেখানে ছুটে গেল।

ওদের সঙ্গে হীরালালও ছিল। সে গাছের নিচে গিয়ে ডাকল, হল্লী, নিচে নেমে আয়, আমার লাগে নি।

কোন উত্তর না পেয়ে দুটি ছেলে চট করে গাছে উঠে পড়ল, কিন্তু গাছে উঠেও তাদের আশা পূর্ণ হল না।

অজিত নিকটবর্তী রেল-স্টেশনে দেখতে গিয়েছিল। তার ধারণা হয়েছিল হল্লী কোথাও পালিয়ে গেছে। সে অজিতকে বাইরে যাবার কথা কখনো কখনো বলতই, অজিত তার কথায় আমোদও পেয়েছে, তবু তাকে কখনো বুঝিয়ে বলেনি যে ঐ কাজ করা অনুচিত। এই জন্য হল্লীর পালিয়ে যাবার বিষয় কিছু উত্তর-দায়িত্বের মানোভাব অজিতের মনে জাগছিল। এদিকে-ওদিকে যারা হল্লীর খোঁজে আশে-পাশের গ্রাম থেকে গিয়েছিল তারা সন্ধ্যায় ফিরে এল। কিন্তু সে ফিরল না।

যারা ফিরে এল তাদের মধ্যে একজন যমুনাকে এসে বলল, অজিত দাদার সঙ্গে পথে দেখা হয়েছিল। স্টেশনে তো কোন খোঁজ পাওয়া গেল না, রাস্তায় একটি রাখালের কাছে কিছু সন্ধান পেয়েছে। সে বীরপুরার দিকে একটি ছেলেকে যেতে দেখেছিল, দাদার বিশ্বাস সেই ছেলেটিই হল্লী। তাই তিনি ঐ দিকেই চলে গেলেন। আমিও সঙ্গে যেতে চাইছিলাম, কিন্তু আমার কাজের ক্ষতি হবে ভেবে আমাকে সঙ্গে যেতে দিলেন না। বললেন, আমি তোমাকে এসে যেন দুশ্চিন্তা না করতে বলি। আহাঃ, কত পরিশ্রম করছেন। সকাল থেকে তাঁর মুখে এক কুচিও খাবার পড়েনি। আমি বললাম, গ্রামে ময়রার দোকানে

গিয়ে একটু জল তো খেয়ে নাও দাদা, তা না হলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে। তিনি বললেন, তুমি আমার জন্য চিন্তা কোরনা, দু-একদিন না খেলে আমার স্বাস্থ্য খারাপ হয় না। যতক্ষণে গাঁয়ের ময়রার দোকানে পৌঁছব ততক্ষণে তো দু-ক্রোশ পথ এগিয়েই যেতে পারব। তাঁর কথা শুনে আমার চোখে জল এল। বৌদি, আমার মন ভাল করেই বলছে অজিত দাদা হল্লীকে সঙ্গে নিয়েই ফিরবেন। হল্লী খুব ভাল স্বভাবের ছেলে, সব সময় সকলের সঙ্গে হেসে কথা বলে। যে শুনছে সেই-ই হায় হায় করছে।

যমুনার চোখে ভাদ্রের যে-মেঘ কিছুক্ষণের জন্য রুদ্ধ ছিল, তার বর্ষণ আবার শুরু হল।

এই সময়ের মধ্যে না জানি কতবার হল্লীর ফিরে আসার আশ্বাসের কথা সে শুনেছে। মনে যার যাই-ই থাকুক, সকলের মুখে একই কথা। ধুন্না চামার থেকে নিয়ে জন্মঠিকুঁজী-বিচারক গয়াদীন পাণ্ডার মতেও তত্ত্বগত কোন বিরোধ নেই। সকলেই বলল হল্লী যথাসম্ভব শীঘ্রই ফিরে আসবে। কিন্তু এই যথাসম্ভব শীঘ্র কবে যে হবে, তা কে জানে। যমুনার কাছে তো সময় হয়েছে নিষ্প্রাণ, তাতে যেন কোন গতি নাই। তার জন্য তো দিনের বেলাতেও দুর্ভাগ্যের এমনি রাত্রি এসেছে—যাতে না আছে আলো, না আছে বিশ্রাম আর না আছে তন্দ্রা। যদি কিছু থাকে তা অশান্তি, কেবল অশান্তি। মাঝে মাঝে আশ্বাসের যত নক্ষত্র তাকে দেখানো হয় সে সব নক্ষত্র স্ব-স্ব স্থানে যতই না কেন উজ্জ্বল হোক, তবু এই সময় তো তার কাছ থেকে সবই বহু দূরে রয়েছে। কোন ঘোর অবিশ্বাস এসে তার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সে কি দেখেনি যে তার বুদ্ধিমান পতি বিদেশে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। কে জানে কোথায়, কোন জাগায় সংসার তাকে ভুলিয়ে রেখেছে। আজও সে ফেরেনি, এক দিনের জন্যও কোন রকমে ফিরে আসেনি। এ অবস্থায় কেমন করে বিশ্বাস হবে যে তার অবোধ ছেলে সংসারের এই নির্মম জালে ভুলে আটকে থাকবেনা, শীঘ্রই ফিরে আসবে। সে অনুমান করতে পারে না সে যে কত বড় অভাগিনী! তার অভাগ্য যদি তারি জন্য হত, তাহলে সে সেই অভাগ্যকে হয়তো এত কঠিন মনে

করত না, কিন্তু তার ভাগ্য যে তার অবোধ পুত্রকে অজ্ঞাত কোন ভীষণ সংকটের মুখে যেন ঠেলে দিয়েছে। সেই অজ্ঞাত সংকটের উদর-পূর্তির জন্য কোথায় গিয়ে সে নিজের কি সর্বনাশ করবে, এটা যমুনা অনুমানও করতে পারছেনা।

[১৭]

হল্লীর সন্ধানে একটানা কয়েক দিন দৌড়-ঝাঁপ করে একদিন সকালে অজিত ফিরে এল। ফিরে আসবার বহু পূর্বেই তার মন দমে গিয়েছিল। তবু দূরের দু-একটি এমন গ্রাম না দেখে সে থাকতে পারেনি, যেখানে যমুনার দূর সম্বন্ধের লোকেরা থাকে। সে জানত যে এই চেষ্টায় কোন ফল হবে না। এই চেষ্টা তো রোগীর নাড়ী ছাড়বার পূর্ব্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত ওষুধ দেবার মতন। শেষ পর্য্যন্ত অজিত ফিরে এল। কতদিন হয়ে গেল, বাড়ীর কাজের জন্য চিন্তা তো ছিলই, সেই সঙ্গে যমুনার সংবাদ নেওয়াও তার কাছে আবশ্যক মনে হতে লাগল। আসতে আসতে তার বিষণ্ন মনে হঠাৎ এই চিন্তা জাগল—এত ঘোরাঘুরি করে তো মরছি, ওদিকে হল্লী ফিরে না এসে থাকে, নিশ্চয়ই ফিরে থাকবে, শীঘ্রই ফেরা উচিত!

যাবার সময় প্রতিবেশিনী রূপাকে বলে গিয়েছিল যেন সে যমুনার বাড়ীতে থাকে। সেই-ই সর্বপ্রথম অজিতকে দেখল। বলল, এসেছ বাবু!

এসেছি, বলে অজিত ধপাস করে বহির্দ্বারের রোয়াকে বসে পড়ল।

নীরবতার কিছুক্ষণ পরে রূপা জিজ্ঞেস করল, কোন খোঁজ পেলে?

খোঁজ পেলে কি আর এমন ভাবে একাই আসতাম? সেখান থেকেই তাকে পিটিয়ে লম্বা করে আনতাম। মা-বাপকে দুঃখ দেবার জন্য এমন সব ছেলে জন্মায় কেন। কি বিপদেই পড়েছি। দীনা এসেছিল?

এসেছিলেন। তোমার অকাতর পরিশ্রমের কথা যমুনাকে বলে-ছিলেন। যমুনা তাই শুনে কাঁদতে লাগল। এমন কে আছে যে অন্যের দুঃখে এত সক্রিয় সহানুভূতি প্রকাশ করে। তখন থেকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে

ঘুরে বেড়াচ্ছ। সেদিন দীনার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছিল তুমি আসবেই আর হল্লীকে তার মায়ের কাছে এনে দেবে। এত পরিশ্রম আর কষ্ট করলে তবুও কিছু হল না। আহা, তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে, মানুষ একটানা রাত-দিন একাকার করে কাজ করলে কতদিন আর তার শরীর টেঁকে—বলে সে হাতের কাছের বাঁশের হাত-পাখা অজিতের হাতে দিল।

পাখা নাড়তে নাড়তে অজিত বলল, দু-চার দিন খাবার না পেলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না। দশ দিন না খেয়েও কুড়ি ক্রোশ পথ হাঁটতে পারি। এবার তো ভাজা ছোলা সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলি নি। পানাহারের কষ্ট আমার হয় না, কষ্ট হয় এই দেখে যে এমন বাড়ী যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। কেমন ভাল ছেলে ছিল, কি দুর্মতিই তার হল। যখনি যেখানে দেখা হত হাত ধরে বলত—কাকা বাড়ী চল, আজ খুব ভাল গল্প বলতে হবে। তার কথাবার্তা এমন বিবেচকের মতন যে লেখাপড়া-শেখা বুদ্ধিমান মানুষও তার কাছে হার মানবে। মনে হত যেন সে ছোট্ট শিশু, তাকে কোলে করে বেড়িয়ে নিয়ে আসি। আমি বলছি হল্লীর দোষ নেই, যমুনাই তাকে বাড়ী থাকতে দেয়নি। কোথাকার বেইমান বাপ, যার ঠিকানা অজ্ঞাত; হয়ত কবেই নতুন জন্ম নিয়ে বসে আছে, তার কথা বলে বলেই ছেলেটির মন খারাপ করে দিয়েছে। যেমন কাজ তার কর্মভোগও তেমনই। সে আছে কোথায়?

যমুনা দিদি? গোয়াল ঘরে গোরু বাছুর দেখছে।

হুঁ, গোরুর সেবা করছে, এই করলেই বুঝি ছেলেকে ফিরে পাবে। জানেনা আজকাল দেবতাও পাথর হয়ে গেছেন। যতই খোশামোদ কর তবুও মন গলে না। এত দিন পর্যন্ত জপমালা হাতে নিয়ে তো বসে আছে বাড়ীতে, কিন্তু কোন ফল হল? স্ত্রী-লোকেদের বুদ্ধি এমনি ওঁছা যে, যতই যা ঘটুক না কেন, তবু নিজের গোঁ ছাড়বে না। আমার করবার কি আর আছে, যা করার ছিল সব করেছি। মাটি দিয়ে ছেলে তৈরি করে তো আনতে পারি না।

দু-তিন দিন হল গোরুর কোন খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না। কারও লক্ষ্যও ছিল না যে গোরু ফিরেছে কি না। বাছুর কাতরাচ্ছে।

তুমি এ আর এক নতুন কথা শোনালে! এই ক-দিন তো ছেলেটার

জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম। এখন আবার গোরুর খোঁজ কর। গ্রামে যদি কারও ফালতু জীবন থাকে তো সে জীবন অজিতের। ঘরের কাজ ফেলে মূর্খের মতন এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়ানো। একদিন যখন চোখ বন্ধ হবে সেই দিনই এইসব ঝঞ্ঝাট হতে মুক্তি পাব।

রূপা চোখ পাকিয়ে বলল, এ কেমন কথা বলছ? অন্যের জন্য তুমি এত কর, তাই সব জায়গায় তোমার প্রশংসা হচ্ছে।

অজিত বলল, রূপা, বর্তমান যুগে কেউ কারও প্রশংসা করে না। লোকেরা তো এই মনে করে যে আমার উদ্দেশ্য খারাপ। যে যা বলতে চায় বলুক; আমি তো নিজের কর্তব্য করি। আজ ফিরে এলাম, আবার আজই গোরুর খোঁজে যেতে হবে। দেখে-শুনে গোরুর গলায় ছুরি বসাবার সুযোগ করে দিতে তো পারি না। কোথায় গোরু থাকতে পারে আমি জানি। এসব সেই চৌধুরীর লোকেদের বজ্জাতি। সেই-ই পাশের মহলের খোঁয়াড়ে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেয়, সেখানে মুন্সীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নীলামে সস্তায় কেনবার জন্য। কতবার এই রকম কৌশল করেছে। এমন লোকের মুখ দেখাও অধর্ম।

এই কথা শুনে রূপা হতবাক হয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে বলল, তাহলে গোরুকে খোঁয়াড় থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এস। যমুনা কিছু শান্তি তো পাক।

গোরু ফেরত পেলে?—অজিত বললে—তুমিও বেশ! গোরু ফিরে পেলে যদি হল্লীর অভাব ঘুচে যায়, তাহলে আমি একটার জায়গায় চারটে গোরু এনে জড়ো করতে পারি। একেই বলে স্ত্রী-বুদ্ধি! কেউ কারও কাছে খাটো হতে চায়না।

যখনই দেখ তখনি হাসি-ঠাট্টা ছাড়া আর কিছু না। এখানে যমুনা দিদির অবস্থা দেখে যদি তুমি না কেঁদে ফেলতে, তা হলে বুঝতাম তোমার মধ্যে কিছু পৌরুষ আছে। এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়িয়ে এলেই, পুরুষ মনে করে সে বিশ্বজয় করে ফেলেছে, আর কিছু বাকী নেই। আমাকে এখানে আটকে রেখে তুমি তো চলে গেলে। আমার অবস্থা যে কী হয়েছিল আমিই তা জানি। থাকতেও পারা যায় না, আর পালিয়েও যাওয়া চলে না।

চিন্তিত হয়ে অজিত জিজ্ঞেস করল, আত্মহত্যার কোন কথা ভাবছে না তো?

অন্যের মনের কথা কে জানে। আমারও ভয় হয় রাত-বিরেতে কিছু না করে বসে। প্রথম রাত্রির কথা ভাবলে বুক এখনো কেঁপে ওঠে। চারিদিক ঘন অন্ধকার, এত গরম যে হাত-পাখার বিরাম ছিল না। মধ্য রাত্রির পরে কোন রকমে একটু তন্দ্রার ভাব হয়েছিল, অমনি একটা শব্দ শুনে তন্দ্রা ভেঙে গেল। দেখলাম উনি নিজের খাটের পাশে দাঁড়িয়ে যেন দূরের কোন শব্দ শুনছেন। আমি ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, একি করছ? বললে, রূপা তুমি শুনতে পাওনি? হল্লী ডাকছে, মা-মা কোথায় আছ, এস। আমার বুক কেঁপে উঠল, এর উপরে কোন বিদেহী-আত্মা ভর করেনি তো! আমি ধমক দিয়ে দিয়ে বললাম, এসব কি আবোল-তাবোল বলছ, শুয়ে পড়। এই অন্ধকারে হল্লী কি আসবে, সে সকালে হাসতে-হাসতে আসবে, যেমন করে স্কুল থেকে হাসতে হাসতে ফিরত। ধরে তাঁকে শুইয়ে দেবার চেষ্টা করতেই আবার বলে উঠলেন ঐ শোন! তারপর আমাকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে দরজার দিকে দৌড়ে গেলেন। কোথাও কোন অন্য শব্দ ছিল না, শুধু সেই রাতের সাঁই-সাঁই শব্দ আর নির্জনতা। আমি ঘাবড়ে গেলাম, আমার কি সেই শক্তি আছে যে তাঁকে ধরে রাখব? কাছে সাহায্য করবারও কেউ ছিল না। আমার ভয় হল পাছে কোথাও কুয়ার মধ্যে ঝাঁপিয়ে না পড়েন। সারারাতটা ভগবানের নাম করে কোন রকমে কাটল।

হঠাৎ যেন নব বলে বলীয়ান হয়ে অজিত বলল, রূপা, তুমি ভেবেছ আমি হতাশ হয়ে পড়েছি, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জেন আমার কথার নড়-চড় হয় না, হল্লীকে খুঁজে বার না করা পর্য্যন্ত আমার স্বস্তি নেই—নেই। আমার অন্তরাত্মা বলছে হল্লী দূরে পালায়নি। কাছে-পিঠে এইখানে কোথাও যমুনার ভয়ে লুকিয়ে আছে। তাঁকে তুমি যেমন-তেমন মনে করনা। এখন কপাল চাপ্ড়ে এদিকে-ওদিকে বেড়াচ্ছে, কিন্তু যখন হল্লী কাছে ছিল তখন তাকে সর্ব্বক্ষণ তাড়না করত। একদিনের কথা শোন, বাঁদরের খেলা দেখবার জন্য হল্লী তার মায়ের কাছে পয়সা চেয়ে ছিল, অমনি যমুনা তার গালে এক চড় বসিয়ে দিল। এর ঢঙ্ দেখ!

ছেলেমানুষ ওরা, পয়সা দিয়ে যদি খেলা না দেখবে তো কি বুড়োরা দেখবে? যখন আমার কানে কথা এল আমি তাকে পয়সা দিতে চাওয়ায়, সে বললে, না কাকা, অন্যের পয়সা নিতে নেই। তার বিবেচনা দেখ! আমি ভালবেসে তাকে আস্তে একটা চড় মেরে বলেছিলাম, ধুৎ, তুই পাগল হয়েছিস! আমি তোদের পর? যদি তাকে পাওয়া যায়, এবার আমি তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে রাখব। যমুনাকে বলে দেব, তুমি এর কেউ না; যাও, যা করতে পার কর।

রূপা ইশারা করে বললে পিছনের ঘরে কিন্তু উনি আছেন।

বেশ, হাজার মানুষের সামনে এই কথা আমি বলে দেব। ছেলেকে মারধোর করা মায়ের ধর্ম নয়। জন্তুকেও যে বিশ্রী রকমে ঠ্যাঙায় তাকে শাস্তি পেতে হয়। গভারমেণ্টের আইন। কেউ অমান্য করতে পারে না।

কেন বৃথা দুঃখিনীকে দোষ দিচ্ছ? এমন মা কে আছে যে নিজের দেহ-জাত অঙ্গের প্রতি মন্দ ব্যবহার করবে। তিনি নিজের দুঃখে নিজেই কাতর, আর তুমি কথা শোনাচ্ছ। মা ছেলেকে স্নেহ না করলে কি পিটুনি দিতে পারে? এই দেখে নিজের ভাগ্যকে আমি ধন্য মনে করি। যদি আমার সন্তান জন্মাত তাহলে এত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারতাম না। ভগবান সব বোঝেন এইজন্য যাকে-তাকে কিছু দেন না। আমাকে কিছু দিলে না তো দিয়োনা হে আমার জগন্নাথ স্বামী, কিন্তু যমুনা দিদির কোল শূন্য করনা। এই-ই আমার প্রার্থনা।

এই কথা বলে রূপা নিজের দু-হাত কপালে ঠেকালে। তার চোখে অশ্রু ছল ছল করে উঠল। অভিভূত হয়ে অজিত চুপ করে বসে রইল।

আবার রূপা বলতে লাগল, উনি কেমন যেন হয়ে গেছেন, ওঁকে দেখে কান্না পায়। গোরু হারিয়ে না গেলে পাগল হয়ে যেতেন। একদিক দিয়ে এটা ভালই হয়েছে। একটা দুঃখের সঙ্গে আর একটা দুশ্চিন্তা এসে জুটলে, দুটোয় মিলে মিশে মনের বেদনা কমে যায়। বাছুরের ডাকাডাকি শুনে যেন তাঁর চৈতন্য হল। বললেন, এই রকম ভাবে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হয়ত হল্লীও কোথাও কষ্ট পাচ্ছে—ছটফট করছে। তার পরেই উঠলেন, আর সেখানে গিয়ে বাছুরটাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। তার পরের দিন অর্থাৎ পরশুই প্রথমবার নিজের হাতে উনুন ধরালেন, আটা

মেখে রুটি সেঁকলেন, তারপর নিজের হাতে রুটি টুক্‌রো-টুক্‌রো করে বাছুরটিকে পেট ভরে খাইয়ে দিলেন। খাওয়াবার সময় থেকে থেকে তাঁর চোখে জল আসছিল! আমি ভাবলাম কেঁদে নিতে দাও, কাঁদলে মন হাল্কা হয়। উনি বাছুরটিকে এমনি ভাবে আদর করলেন যেন নিজের বুকের দুধ তাকে খাওয়াতে চান। ঐ কাণ্ড দেখে স্তম্ভিত হয়ে রইলাম।

ধীরে ধীরে যমুনা এসে দেয়াল ধরে দাঁড়াল। অজিত লক্ষ্য করল তার মুখ ম্লান, নেত্র নিরীহ, নিশ্চল, তাতে কোন রকমের স্ফুরণ নেই। অন্তরের ভাব যেন অন্তরেই মূর্চ্ছিত, বাইরে এসে তা প্রকাশিত হতে পারছেনা।

যমুনার দুঃখের যে চরম ঝঞ্ঝার রূপ কল্পনা করে অজিত এসেছিল, তা না দেখতে পেয়ে তার মন কিছুটা হালকা হল। তবু সে এ বিষয় নিঃসন্দেহ হতে পারেনি যে, ঐ ঝঞ্ঝার উৎপাতের আশংকা আর নাই। সেই ঝড় থেমে তো গেছে, কিন্তু আকাশের রঙের প্রকৃতি পূর্ববৎ আছে। কাজেই আবার কোন সময় যে উগ্র হয়ে উঠবে তার নিশ্চয়তা নাই।

সে বললে, যমুনা, তুমি চিন্তা কোরনা। হল্লীকে শীঘ্রই খুঁজে তোমার কাছে এনে যদি না দিই তখন বল। আমি গণনা করিয়ে নিয়েছি। সে গণৎকার আমাদের গঙ্গাদীন পাঁড়ের মতন নয়। তিনি দিগ্বিজয়ী, কাশীর জ্যোতিষ শাস্ত্র পড়েছেন। দু-টাকা নিয়ে ভূত, ভবিষ্যৎ সব বলে দেন। তাঁর কথা কখনো মিথ্যে হয় না। জিজ্ঞেস কর রূপাকে, কিছুক্ষণ আগেই আমি তাকে বলেছি যে হল্লীকে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই—স্বস্তি নেই!

যমুনা ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, এখন কোত্থেকে এলে? অজিত কয়েকটি গ্রামের নাম করল, শেষের নাম শুনে যমুনা বলল, নয়া গ্রাম পর্যন্ত!

কি করব যেতেই হয়েছিল। যে-সব ছেলেরা পালিয়ে যায় তারা দূর-সম্পর্কীয়দের সম্বন্ধ স্মরণ করেই পালায়, যাতে কেউ সহজে সন্ধান না করতে পারে। এই বার আজ দক্ষিণ দিকে যাব। পণ্ডিত মশায় বলেছেন সে উত্তরের দিকে যায়নি, এই রক্ষে। উত্তরের দিকের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। সে দিকে যে যায় সে আর ফেরেনা।

যমুনা বলল এখনি তুমি গোরুর কথা বলছিলে, কোথায় থাকতে পারে ?

সেখানে অন্য কেউ গিয়ে কিছু করতে পারবেনা। আমি ঐ দিকেই যাচ্ছি, গোরুরও খোঁজ নেব। তুমি কোন চিন্তা করনা।

অজিত যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে দেখে, দাঁড়াও বলে যমুনা ঘরের ভিতরে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে হাত বাড়িয়ে অজিতকে টাকা দিতে চাইল। অজিত বিস্মিত হয়ে বলল, টাকা কেন ?

হাতের টাকা হাতে ধরেই যমুনা বলল, কাশীর পণ্ডিতের দক্ষিণা।

ম্লান মুখে অজিত বলল, এ আর এমন বড় বিষয় কি ; তুমি দিলে কিম্বা আমি দিলাম। এখন থাক, পরে দেখা যাবে।

যমুনা তবুও হাতে টাকা নিয়েই দাঁড়িয়ে রইল। অগত্যা ক্ষুণ্ণ মনে অজিতকে সে টাকা নিতেই হল।

[১৮]

অজিতের অনুমান সর্ব্বাংশে ঠিক না হলেও আংশিক ঠিকই ছিল। যে খোঁয়াড়ে গোরু থাকতে পারে ভেবেছিল সেই খোঁয়াড়েই গোরু পাওয়া গেল। পরের দিন গোরু নিয়ে সে ফিরে এল।

সেই-ই গোরু খুঁজে বার করেছে, এই আনন্দ তার খুবই ছিল, কিন্তু আজ রৌদ্র-তাপে সে অসুস্থ বোধ করছে। গোরুকে গোয়ালে রেখে সে দড়ি দিয়ে বোনা একটি খাটিয়ায় এক জায়গায় গিয়ে ক্লান্ত ভাবে শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে অল্প দূরে যমুনার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে সে বললে, শুনে যাও।

যমুনা সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। অজিত বলল, দেখ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। গোরু-মোষদের খোঁয়াড়ে কিছু খেতে দেয় না— উপোস করিয়ে রাখে। সেখানকার মুন্সী তো হিন্দুই, কিন্তু আমার মনে হল কশাই। নানা রকম টালবাহানার পর গোরু ছাড়ল। মুসলমান হলে এত নির্দয় হত না। তাদের ধর্মে যে রকম বিশ্বাস আমাদের তেমন নেই। এই জন্যই তো ওদের এত উন্নতি! যেখানে যাও সেখানেই দেখতে পাবে

দারোগা মুসলমান, তহশীলদার মুসলমান। এখন গোরুকে ভাল করে খেতে দিতে ভুলে যেয়োনা। সেখানে বেচারীকে জলও খেতে দিয়েছে কিনা কে জানে।

মাথা নেড়ে নীরবে যমুনা ফিরে গেল। গোরুর সেবাই সে করছিল। কিন্তু অজিত যমুনার মুখের ত্রুটি কথা শুনতে চাচ্ছিল, কাজেই যমুনা কোন কথা না বলে চলে যাওয়ায় অজিত ক্ষুণ্ণ হল।

কিছুক্ষণ পরে ঐদিক দিয়ে যাবার সময় যমুনা সহসা দাঁড়িয়ে পড়ল। শুয়ে অজিত একটু কাতরাচ্ছিল, যমুনা তা শুনতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, শরীর কি ভাল ঠেকছেনা?

একটু পাশ ফিরে অজিত দেখল যমুনা তার খাটিয়ার পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে। হয়তো রৌদ্রের তাপ একটু লেগেছে, বলে সে অন্য দিকে পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

যমুনা দাঁড়িয়েই অজিতের কপালে নিজের ডান হাত রাখল, বলল, গা গরম, লু তো লাগেনি?

অজিত কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইল। যেন তার সমস্ত দেহ অবসন্ন হয়ে পড়েছে। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, গা-টা কিছু গরম হয়নি। তুমি এখন নিজের কাজে গিয়ে মন দাও, এমন তো হয়েই থাকে।

যমুনা তার কপালে হাত রেখেই বললে, না, কপাল গরম। এ রকম অবস্থায় বাইরে খোলা জায়গায় থাকা ঠিক নয়। ওঠো, ভিতরে খাট পেতে দিচ্ছি।

অজিত বলল, ভিতরে খুব গরম। কিছুক্ষণ এখানে বিশ্রাম করে নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে! এখনি বাড়ী যাব।

কোন কথা না বলেই যমুনা এক হাত দিয়েই তাকে ধরে উঠিয়ে দিল এবং খাটিয়াটি ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে তাতে একটি সতরঞ্চি পেতে দিল।

অজিত বলল, তুমি তো এমন করছ যেন আমার সন্নিপাতের ব্যাধি হয়েছে।

যমুনা বলল, শুয়ে থেকো, যেয়োনা, আমি এখনি আসছি।

কোথায় যাচ্ছ, শশা আর প্যাঁড়ার সরবৎ আনবার জন্য? লু আমার

লাগে নি। এসব কিছু করবার দরকার নাই। তোমার মতন বৈদ্য কারও ভাগ্যে জুটলে তো তার ভরসা ভগবান। ব্যাথা পেটের, আর ওষুধ…

পেটে ব্যথা হচ্ছে?

পেটে না তো কি চোখে! অজিত বলল—আজ রবিবার তো? রবিবারেই হল্লী,…রবিবারের উপবাসের জন্য পেট খালি ছিল, আর হাঁটতে হল রোদ্দুরে। এই জন্যই তোমার মনে হচ্ছে আমার গা গরম। এ কিছু না, আর একটু বিশ্রাম করে বাড়ী গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর যমুনা বলল, আজ এই খানেই ভোজনের ব্যবস্থা হবে, যেয়োনা। বলে সে ভিতরে চলে গেল।

প্রদীপের আলোয় অজিত খেতে বসে বলল, দেখ যমুনা, আমার মতন ক্ষুধা-ক্লিষ্ট মানুষকে প্রশ্রয় দেওয়া ভাল না। যদি রোজ এসে পড়ি তাহলে মুশকিলে পড়বে।

এমন করে রোজ আসবার লোক তুমি! আজ যদি শরীর বিকল না হত তাহলে কি…।

ভগবান করুন এই রকমই যেন রোজ শরীর খারাপ হয়। কপালে তোমার হাতের স্পর্শ কেমন শীতল অনুভব করছিলাম। যে-গুণ কোন বৈদ্যের ওষুধেও নাই সেই গুণ তোমার হাতে আছে। আমার ভয় হয়েছিল, কাল সকালে এমন কিছু না হয় যার ফলে আমার আবার যাওয়ায় বাধা পড়ে। এখন সে-ভয় কেটে গেছে। সেখানে গিয়ে যদি কড়া লু লাগেও, তাহলে তুমি আমার কপালে হাত দিলেই তখনি তার প্রভাব কেটে যাবে—মন্ত্র-বলে সারিয়ে দেবার মতন। এমনি কোন মন্ত্র আমাকেও শিখিয়ে দাও।

খুব বড় বড় কথায় প্রশংসা করতে করতে, ভোজন সেরে হাত-মুখ ধুয়ে, অজিত উঠোনে খাটের উপরে এমনভাবে গিয়ে বসল যেন কাজের কয়েকটি কথা বলেই উঠে বাড়ী চলে যাবে। সে বলল, রূপা এখনো কই এলনা তো, আমি গিয়ে এখনি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর শোনো উপবাস করে করে এমন অবস্থা করনা যে, হল্লী বাড়ী ফিরে এসে দেখবে তুমি খাটে অজ্ঞান হয়ে শুয়ে আছ।

উপবাস করছি কখন। পাপী পেট মানলে তবে তো! বলে যমুনা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তুমি যে কিরকম উপবাস করনা, তা আমি জানি। দুঃখ মানুষের উপরেই এসে পড়ে, গোরু এর কি বোঝে। তুমি দুঃখ কোরনা। কেঁদে কেঁদে মাথা খুঁড়লে হল্লী ফিরে আসবে না। সে ফিরে আসবেই, একথা আমি বাজি রেখে বলছি। ওঠ, গিয়ে কিছু খাও। যতক্ষণ কিছু না খাবে, আমি যাবনা। দেহে ভগবানের বাস, দেহকে কষ্ট দিলে পাপ করা হয়।

যমুনা মৃদুস্বরে বলল, কাল খেয়েছি। আজ এমনিতেই উপবাস ব্রত পালন করছি।

আজকের ব্রত আমিও পালন করি, সূর্যদেবতার বার আজ। কিন্তু এখন ব্রত উদ্‌যাপনের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সময়মত খাদ্য না খেলে ব্রত উদ্‌যাপনের ফল পাওয়া যায় না।

যমুনা চুপ করে রইল।

এমন যদি বুঝতাম তাহলে আমিও মুখে খাবার তুলতাম না। ভেবেছিলাম আমার খাওয়ার পর তুমি অন্নের অনাদর করবে না। যাকগে, তুমি যদি কথা না শোন, বলব না। সকলেই জানে তুমি যা স্থির কর তা আঁকড়ে থাক, ছাড়তে চাওনা, তুমি এমনি জেদী! একটা কথা বলে যাই। আমি খুব ভোরেই উঠে চলে যাব, দেখা করে যাবার সময় পাব না। একটা ঠিকানার খোঁজ পেয়েছি। এতক্ষণ তা তোমাকে বলতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু তোমাকে ধাপ্পা দেওয়া ঠিক নয়। ফিরতে না-ও পারি এমনও হতে পারে।

অজিতের এই কথা শুনে যমুনার বুক কেঁপে উঠল। সে জিজ্ঞেস করল, কি ঠিকানা পেয়েছ?

অজিত বলল, খবরটা খুব যে বিশ্বাসযোগ্য তা নয়, অনুমান মাত্র। যদি আমার কিছু হয়েই যায় আর যদি নাই-ই ফিরতে পারি, তা হলে যেন হল্লী সেইখানেই আছে। তখন তুমি পুলিশের সহায়তা নিয়ে যেয়ো। আমি যদি রক্ষে নাও পাই তবু ছেলেটিকে তো পাওয়া যাবে।

যমুনা ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করল, কি সন্ধান পেয়েছ?

অজিত বলল, সিরসার জঙ্গলে বেদেরা আস্তানা গেড়েছে। গতবার এরাই একটি ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। হতে পারে এবারও…কিন্তু এটা অনুমান মাত্র। এরা ছেলেদের নিয়ে গিয়ে কি করে, কোথাও বিক্রি করে দেয়, অথবা তাদের ভাগ্যে কি ঘটে ভগবানই জানেন। হল্লী যদি সেখানে থাকে, সেখানে তার মনে ক্লেশ পেলেও তবু তাকে পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, আমার সংকটের সম্ভাবনা আছে, যদি তারা টের পায় আমি তাদের খোঁজ নিতে যাচ্ছি। সুতরাং আমি থানার বড়বাবুকে বলে যাব, তিনি সহায়তা দেবেন। তাহলে এখন আসি।

দৃঢ়স্বরে যমুনা বলল, না, আমি যেতে দেব না।

যেতে দেবে না? আমি এখানে রাত্রিতে কেমন করে থাকব!

তবু যমুনা বলল, সেখানে যেতে দেব না।

সবিস্ময়ে অজিত বলল, আমাকে যেতে না দিলে কে আর যাবে? যেমন-তেমন কোন মানুষ তাদের রহস্য ভেদ করতে পারবে না।

আমি যাব।

অজিত শুষ্ক হাসি হেসে বলল, তুমি ওখানে যাবে? জান, ওরা কিরকমের ডাকাত?

যাই হোক, আমি তোমায় যেতে দেব না। তোমার উপরে এমন কি জোর আছে যে তোমাকে সংকটে ফেলব। তুমি যে উপকার করলে তা আমার মর্মে মর্মে গাঁথা আছে। তুমি যেমন করে আমার উপকার করেছ, তেমন করে কারও কোন আপন আত্মীয়স্বজনও করে না। সামনে এসে দুটো মিষ্টি কথা সকলেই বলতে পারে, বিপদের সময় প্রাণ দিয়ে কেউ সহায় হয়ে এগিয়ে আসে না। এই দু-চার দিনের মধ্যেই অনেক দেখেছি। আমি তো এখানে বসে কান্নাকাটি করি, কাজের কাজ কিছুই করতে পারিনা। তুমি না দুপুর, না রাত্রি কিছুই গ্রাহ্য করনা, রাত আর দিন একাকার করছ। অনেক করেছ, তোমাকে আর বিপদে পড়তে দেবনা—বলে যমুনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আমি স্বেচ্ছায় যাচ্ছি। তুমি কেন যেতে দেবে না?

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে যমুনা বলল,—আমার কপাল তো পোড়াই, এর উপরে আবার অন্যের ঋণের দায় কি রকম করে সামলাব।

কিসের ঋণ যমুনা, কখনো একটা কানাকড়িও তোমার জন্য খরচ করতে দাওনা।

তোমার উপরে আমার এমন কোন জোর নাই যে তোমাকে ছোটাছুটি করতে বলব। পথ আমি চিনি, আমি নিজেই যেতে পারব।

তুমি গেলে তো কাজই নষ্ট হয়ে যাবে। আমি কী মূর্খের কাজই না করেছি তোমাকে এই খবর দিয়ে,—বলে অজিত চুপ করে রইল।

যেটাতে কাজ নষ্ট না হয় সেইরকমই কর, একদিন তুমি বলেছিলে···

কি বলেছিলাম?

বলতে আমার লজ্জা বোধ হচ্ছে না। তুমি বলেছিলে—নতুন করে আবার ঘর পাততে। যদি তোমার সম্মতি থাকে, তা হলে আমার জন্য কোথাও যেতে চাইলে বারণ করব না।

আমার সম্মতি হবেনা? তোমার সঙ্গে ঘরগেরস্থালি পাতালে আমার জন্ম সফল হবে। এমন সুখ আমার ভাগ্যে কোথায় ছিল। কিন্তু এই সময় এই প্রসঙ্গ কেন পাড়ছ? আমি ভালো মানুষ নই, কিন্তু এমন ছোট লোকও নই যে এই পরিস্থিতির সুযোগে কোন কথা পাকা-পাকি করিয়ে নেব।

যদি সম্মতি না থাকে তাহলে পরিষ্কার ভাবে বলে ফেল। যদি কোন নিন্দের কথা শুনে থাক, তাও গোপন কোরনা। তাহলে আমি কোন বিষয়ে তোমাকে কোন অনুরোধ করবনা।

অজিত লক্ষ্য করল, যমুনার চোখ ছল ছল করলেও তাতে রয়েছে জ্বলন্ত অঙ্গারের দীপ্তি। ক্ষণকালের জন্য তার আনন্দের দীপশিখা যেন কোন ভয়ের ঝাপ্‌টায় কম্পিত হয়ে উঠল। তবু তৎক্ষণাৎ সে বললে, তোমার শত্রুরাও তোমার নিন্দে করতে পারে না। আমার সম্মতির কথা কি জিজ্ঞেস করছ, এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আমার পক্ষে আর কিছুই নেই যমুনা। তোমার আদেশেরই প্রতীক্ষায় ছিলাম। কিন্তু এটা আমি চাইনা যে তুমি আমার জন্য তোমার মনের বিচারের বিরুদ্ধতা কর। তোমার সম্মতিতেই আমার সম্মতি—তুমি কেঁদনা।

এই কথা বলে অজিত যমুনার ঘোমটার কাপড় দিয়ে তার চোখের জল মুছে দিল।

তুমি আমার হল্লীকে কত ভালবাস, স্নেহ কর, তোমার জন্য আমি নিজেকে শত খণ্ডে যদি কেটে ফেলতে পারি তাতেই আমার মনের আনন্দ হবে। বলে যমুনা কাঁদতে-কাঁদতে ঘরের ভিতরে চলে গেল।

উঠানের একটি কোনা চাঁদের স্বচ্ছ আলোয় ছেয়ে গিয়েছে সেইজন্য সেখানে অন্ধকারেও দর্শনীয় উজ্জ্বলতা এসে পড়েছে। ঘরের ভিতরে যমুনার অস্ফুট কান্না শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। তার পর সব নিস্তব্ধ। অজিত যেখানে ছিল সেইখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

[১৯]

হীরালালের গায়ে পাথর ছুঁড়ে হল্লী পালাল, সে এটা ভাবলনা যে কোথায় যাচ্ছে। ঐ সময় পালানোই তার দরকার ছিল।

সে এক জায়গায় এসে থামল, এদিক-ওদিক তাকিয়ে, নির্জনতা সত্ত্বেও সে আবার এগিয়ে চলল।

চলতে চলতে সে ভাবতে লাগল, এখন নয়, সন্ধ্যা হোক। যখন ফিরব তখন অন্ধকার হয়ে যাবে ; সকলের বাড়ীর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে ; কোথাও কেউ নাই, চারিদিক নির্জন, স্তব্ধ, সেই সময়েই গিয়ে পাশের বারান্দায় এমন ভাবে শুয়ে থাকব যে কেউ-ই টের পাবেনা। সকালে কোন কাজে সেখানে গিয়ে মা আমায় দেখে চমকে উঠবেন, এই যে হল্লী তো এই খানেই আছে! এই কল্পনায় তার এমনি আনন্দ হল যেন সে কানামাছি খেলায় জয়ী হয়েছে।

এই কল্পনায় বিভোর হয়ে সে এগিয়েই চলল। দেখল, সে একটি বনের মধ্যে এসে পড়েছে। আশেপাশে কেউ নাই। জমি উঁচু-নিচু, কোথাও নিচে, কোথাও উঁচুতে ছোট-ছোট টিপি। যত দূর দৃষ্টি যায় শুধু গাছ আর গাছ, যেন জায়গাটা গাছের বস্তি। দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল কোথায় সে এল। গ্রামের আশেপাশের জায়গা তার দেখা আছে। এই স্থান তার অপরিচিত নয়। এখানে কতবার পূর্বে এসেছিল। তবু সে ঠিক করতে পারছে না গ্রামের পথে যেতে হলে কোন

পাকদণ্ডীর পথ ধরবে। তার অবস্থা হল ঠিক সেই মানুষের মতন যে নিজেরই মহানগরীর অলিগলিতে ঢুকে দিশেহারা হয়ে যায়।

কাছাকাছি কোন মানুষকে দেখতে না পেলেও, দূরে একপাল ছাগল চরছে দেখে তার আনন্দ হল। উঁচু-নিচু এই জমিতে এখানে সেখানে বুনোফলের শুকনো ঝোঁপ-ঝাড় রয়েছে; সেই সব ঝোঁপ-ঝাড়ের একটি ছোটখাটো বাবলা গাছের পাতা লাফ দিয়ে দিয়ে ছাগলেরা খাচ্ছে। হল্লীর মনে হল সে এইবার ঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে, কিছু দেরি হবেই, কিছু আরও দেরি হয় তো হোক, তাতে ক্ষতিই বা কি।

কিন্তু তার কাছে পাকদণ্ডী পথগুলি ঐ সব ছাগলের মতই। সে ছাগল গুলিকে পৃথক-পৃথক ভাবে যেমন চেনেনা, তেমনি পাকদণ্ডীর পথগুলিও পৃথক-পৃথক ভাবে চেনেনা। কিছু চিন্তা করার পর সে একটি পাকদণ্ডীর পথ ধরে চলল। তবুও তার মনে হল এই জনহীন প্রান্তর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য সে যে সরু পাকদণ্ডী পথ বেছে নিয়েছে, সেটা মধ্যপথেই কোথাও বিচ্ছিন্ন হয়ে তাকে আরও গভীর বনে নিয়ে যেতে পারে।

কিছু দূরে এগিয়ে যাবার পর এই বুঝে তার আনন্দ হল যে সে খুব বেশি উলটো পথে এসে পড়েনি। এখান থেকে সে দেখতে পেল অনতি-দূরে ধ্বংস-প্রাপ্ত একটা কিছু। এটা হচ্ছে অতীতের কোন বাগানবাড়ীর অবশিষ্ট অস্তিত্ব। গাছগুলি বন্য হয়ে গেছে, চারিদিকের দেয়াল ভেঙে পড়েছে। একদিকে ইট-চুনে গাঁথা কয়েকটি মাত্র দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু সেই দেয়ালগুলি তাদের ছাতের বোঝা নিচে নামিয়ে রেখেছে। সেই নামানো ছাতে কিছু কিছু কচি ঘাস আর ছোট ছোট অশ্বত্থ গাছ গজিয়েছে বলে সে ভেবে ছিল যেন সেটা সমতল ভূমি। কেবল সেখানে আছে একটি কুয়া। কূপটি জীর্ণ হওয়া সত্বেও, জলের জন্য তা পথিকদের এবং গোরুর গাড়ী চালকদের আকৃষ্ট করে। দলে পড়ে কতবার হল্লী এখানেও সমবয়সীদের সঙ্গে এসেছিল। তার গ্রাম হতে এখানকার দূরত্ব দেড় ক্রোশের বেশি নয়।

কূপের কাছেই একটা বট গাছের ঘন ছায়ার তলায় বিশ্রাম নেবার জন্য একটা গোরু গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্রাম নেবার জন্য আরোহীরাও নেমে পড়েছে। পুরুষটি কূপের থেকে ঘটিতে জল তুলছে আর স্ত্রীলোকটি

পোঁটলা থেকে কিছু বার করে আবার তা গাড়ীতে এক কোনায় গুছিয়ে রাখছে। দুটি শিশু কিছু দূরে মনের আনন্দে খেলা করছে। ছেলেটির বয়স প্রায় তিন-চার বছর, আর তার দিদির বয়স ছয়-সাত। বিশ্রাম নেবার জন্য হল্লী কুয়ার উপরে বসে সমবয়সীদের খেলার আনন্দ উপভোগ করতে লাগল।

ছেলেটি চেঁচিয়ে বলে উঠল, মা, দিদি আমাকে মারছে।

মা ধমক দিয়ে বলল, ভাইকে কেন মারছিস?

মারছিনা মা, কি জানি কার এঁটো দাঁতন কাঠি মাটি থেকে তুলছিল, আমি বারণ করেছি—বলে মেয়েটি হাসতে লাগল।

তার হাসি হল্লীর খুব ভাল লাগল। তার ইচ্ছে হল গিয়ে ঐ মেয়েটির সঙ্গে খেলা করে।

শিশুটি বলল, আমি কুঁয়ো খুড়ছি, দিদি খুঁড়তে দিচ্ছেনা। কুঁয়ো থেকে জল বার হবে।

বাঃ, কেন খুড়তে দিচ্ছে না, আমার তো তেষ্টা পেয়েছে—বলে হল্লী চটকরে ওদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।

একটা শুকনো কাঠির ডগা ছুঁচালো করে সে ঐ শিশুর সহযোগী হল কূপ খননের কাজে। কিছুটা গর্ত খোঁড়ার পরও যখন কূপে জল দেখা দিল না, তখন সে একটা কৌশল উদ্ভাবন করল। ঐ শিশুর বাপের কাছ থেকে করপুট ভরে জল এনে ঐ গর্তে ঢেলে দিল। মেয়েটিও কিছু ভাবল, সে বাপের হাত থেকে ঘটি কেড়ে নিয়ে এসে ঘটির পর ঘটি জল গর্তে ঢালতে ঢালতে বলল, তোমার জল শুকিয়ে গেছে, এই আমি জল বার করেছি।

হল্লী বলল, বেশ কথা, কূপ খুঁড়ল ছোট ভাই, আর জল বার হল তোমার হাতে। এই জলে কেউ না ডুবে মরে!

ভাই-বোন নিজেদের কুঁয়োর চারিদিকে ঘুরে ঘুরে খেলা করছে, হল্লীও তাদের সঙ্গে জুটেছে। মা দূর থেকে দেখে বলল, বাঃ, কার ছেলে, দেখে বুক জুড়িয়ে যাচ্ছে!

ঐ ভাই-বোনদের সঙ্গে কুয়োর চারিদিকে ঘুরপাক দিতে দিতে হল্লী মাটিতে পড়ে গেল—যেন হোঁচট খেয়ে পড়েছে। শিশুদের সহায়তায় উঠে সে বলল, তোমরা না থাকলে কুঁয়োর জলে ডুবেই যেতাম।

তিনটি শিশুর মৃদু কণ্ঠের হাসাহাসিতে ঐ জায়গাটি গুঞ্জরিত হয়ে উঠল। শিশুদের মাকে নিজের দিকে উন্মুখ হতে দেখে হল্লী পরিচয়ের জন্য জিজ্ঞেস করল, কাকী, এই গাড়ী কোথায় যাবে?

জগদম্বার মেলায়!

হল্লী সানন্দে বলল, কেমন ভাল মেলা—সেটা! গত বছর হীরা সেখানে গিয়েছিল। আমিও যাচ্ছি, ওখানকার জগদম্বার এমনি মহাত্ম্য যে-যা কামনা করে তাই পূর্ণ হয়। এর আগে কি কখনো সেখানে গিয়েছিলে, কাকী?

সে নিজের পতির দিকে আড় চোখে ইঙ্গিত করে বলল, উনি একবার বেড়িয়ে এসেছেন, স্ত্রীলোকদের কেউ কোথাও যেতে দেয়না।

আমি নিয়ে যাব, চল কাকী আমার সঙ্গে। আমি ভাল করে দর্শন করিয়ে দেব। সেখানে তুমি যা যাচ্ঞা করবে তাই পূর্ণ হবে। জগদম্বার এমনি প্রতাপ। আমার বইতে লেখা আছে—পর্বতে কূপ খুঁড়লে কেমন করে জল বার হবে, কিন্তু তাঁর দয়ায় ওখানে পর্বতেও মিঠে জলের কুণ্ড আছে। পাহাড়ে কূপ খুঁড়লে এমনি করেই জল বার হয়।

অপরিচিতার পতি বলল, অনেক দেরি হয়ে গেল, এতক্ষণে পিছনের গাড়ী এসে পড়বার কথা। আমি দেখে আসি কিছু ভেঙেচুরে যায়নি তো—!

স্ত্রীলোকটি ঐ কথায় কান দিলনা। সে হল্লীর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাচ্ছে।

পুলিশের দুজন লোককে ঐ দিকে আসতে দেখে তার চৈতন্য হল যে তার স্বামী এখনো ফিরে আসেন নি। সে মনে মনে বলল, এই লোকেরা যদি জিজ্ঞাসাবাদ করে, তাহলে আমি কি করব! আমাকে এই অবস্থায় একলা ফেলে যাওয়াটা তিনি উচিত মনে করলেন।

সেপাইরা নিকটে আসবার আগেই শিশু দুটি মায়ের পেছনে এসে দাঁড়াল। হল্লী বলল, ভয় কেন পাচ্ছ, ওরা তো থানার লোক।

ওদের মাতাও শঙ্কিত হয়েছিলেন, কিন্তু হল্লীর এই নির্ভয়-ভাব দেখে উনি ভরসা পেলেন। কোথাও যাবার সময় একবার পুলিশের লোকেরা

এই বলে তাঁর গাড়ী আটকে দিয়েছিল যে, সন্ধ্যের সময় গাড়ী যেতে দেবার হুকুম নাই; তোমাদের সব লুট-পাট হয়ে যাবে আর আমাদের মাথায় বাজ পড়বে। যা হোক কিছু দিয়ে-টিয়ে সে যাত্রা তো নিস্তার পাওয়া গিয়েছিল। আজকেও যদি সেই রকমের কোন ঝঞ্ঝাট হয়, তাহলে কি হবে?

গাড়ী কোথায় যাবে? কর্কশ কণ্ঠে একটি সেপাই জিজ্ঞেস করল।

হল্লী বলল, জমাদার সাহেব নমস্কার! গাড়ী জগদম্বার মেলায় যাবে। সামনের গ্রামে রাত কাটিয়ে খুব ভোরে আবার যাত্রা করব।

দ্বিতীয় সেপাইটি সংকেতে কিছু জিজ্ঞেস করল। প্রথম সেপাইটি উত্তরে বলল, থাকগে, যেতে দাও, এখনো অনেক দিন আছে।

জমাদার সাহেব নমস্কার। এই ছেলেটি খুব ভীতু, একে সঙ্গে নিয়ে যান। বুঝিয়ে দেবেন। বলে হল্লী হাত জোড় করে চলনোন্মুখ সেপাইদের আবার নমস্কার জানাল।

একটি সেপাই হেসে বলল, ছেলেটি জ্যাঠা। তার পর ওরা চলে গেল।

স্ত্রীলোকটি যেন ধড়ে প্রাণ পেল। সে এমন ছেলে দেখেনি যে পুলিশের সঙ্গে এমন নির্ভয়ে কথাবার্তা বলতে পারে। ছেলেদের কথা তো দূরে থাক, নিজের স্বামীর কাছেও সে এই নির্ভীকতা আশা করেনি।

কিছুক্ষণ পরে দ্বিতীয় গাড়ীর সঙ্গে তার স্বামী এসে উপস্থিত হলেন, এবং যখন বলদ জুড়ে গাড়ী চলল, হল্লীও তাদের সহযাত্রী হয়ে গেল।

[২০]

বেদেদের আড্ডা হতে পরাজিত মনে আর ক্লান্ত দেহে অজিত গ্রামে ফেরা মাত্র হল্লীর ফিরে আসার সংবাদ পেল, যমুনার বাড়ীর উঠোনের দরজার কাছে গিয়ে দেখল, সে অনেকগুলি ছেলের মাঝখানে বসে নিজের ভ্রমণবৃত্তান্ত শোনাচ্ছে।

অজিতকে দেখে ছেলেরা মহা উৎসাহে বলল, কাকা ফিরে এলে।

অজিত হেসে বলল, তোমরা তো এমন ভাবে বলছ যেন আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম আর যেন তোমরাই আমাকে খুঁজে বার করেছ।

তাকে জড়িয়ে ধরে হল্লী বলল, কাকা, তুমি বেদেদের সঙ্গে কেন কথা বলতে গেলে, ওরা যদি তোমায় খুন করে ফেলত তাহলে কি হত?

খুন করে ফেললে ভালই হত, হল্লী। তুই খুব কষ্ট দিয়েছিস।—বলে অজিত তাকে সস্নেহে একটা মৃদু চড় মারল।

কাকা তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ভালই করেছ, নইলে যমুনা কাকী তোমার সন্ধানে যাবেন স্থির করেছিলেন—বলে হীরালাল সেখানে তার উপস্থিতি প্রমাণিত করল।

তুমি!—বলে অজিত অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

হল্লী বলল, কাকা হীরার প্রতি বিরক্ত হয়োনা। ও আমার বন্ধু হয়ে গেছে। সেদিন ও আমাকে গালি দেয়নি, দিয়েছিল কোতোয়ালকে। আমি কোতোয়াল হয়ে ওর পেছনে দৌড়েছিলাম।

হল্লীও আমার উপর পাথর ছোঁড়েনি। চোরের উপর পাথর ছুঁড়েছিল। চোরকে এই রকম শাস্তি দেওয়া হয়।—হীরালাল বলল।

হল্লীকে আদর করার পর অজিত রান্নাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। যমুনা উনুনে চাপানো কড়াইতে খুন্তি নাড়ছিল। মাথার কাপড় মাথায় ছিল না। উনুনের তাপে তার পাণ্ডু মুখে স্বেদকণা চিক্-চিক্ করছিল। অজিতের পায়ের শব্দ শুনেই সে মাথায় শাড়ী টেনে সামলে বসল। ক্ষণেকের জন্য অজিতকে স্তব্ধ করে রাখল সৌন্দর্য্যের কোন বিচিত্র ছটা।

সে বলল, দেখ, আমি কি বলিনি যে হল্লী শীঘ্রই ফিরে আসবে? ভগবান বড়ই দয়ার সাগর, উনি সকলের মান রক্ষা করেন। কখন এল?

যমুনা বলল, সকালেই, কিন্তু তুমি তো রাত থাকতেই চলে গিয়েছিলে।

অজিত বলল, ঐ সময় না গেলে এই সময় কেমন করে ফিরতাম? দেখ, আর ওকে কোন রকম তাড়না কোরনা।

অজিত দেখল যমুনা তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, এসে সে মাথা নত করে, তার দুই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে হাত দুটো নিজের মাথায় ঠেকাল।

সহসা সে সংকুচিত হয়ে উঠল। তার মনে হল যে-বস্তু তার পা ছুঁয়ে গেল, তা মাথায় দেবার মতন।

যমুনা বলল, আমি কিছু করবনা। তাড়না করতে হয় তুমি কর, না করতে হয় কোরনা। আমি তো হারিয়েই বসেছিলাম।

আমার দ্বারা তো কিছুই হয়নি, যমুনা।

কিছুই হয়নি, এটা তোমার কথায় মেনে নেব? তুমি হল্লীর জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত হয়েছিল বলেই তো ভগবান ওকে ফিরিয়ে আনলেন। ভগবান দেখলেন তাঁর দেওয়া দানের জন্য মানুষ কত দুঃখ সহ্য করতে পারে। আজ সারাদিন এই কথাই আমার মনে হচ্ছিল। সুখের জন্য দুঃখের ষোল আনা মূল্য দিতে হয়। তুমি এতটা না করলে আমার ভাগ্যে আরও কত ছিল কি জানি। আমি তো এতই অভাগিনী যে সর্বদা সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছি, কখনো…

কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। সে আর কিছু বলতে পারল না।

[২১]

অজিত ভাবতে পারেনি যে এই ব্যাপার এমন অনায়াসে এমন ভাবে ঘটতে পারে। কোন নিগূঢ় আকর্ষণে সে যমুনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠেছিল। আকর্ষণটা ছিল হয়তো রূপের আকর্ষণ। তার মনে হল যেন নির্জনে যেতে যেতে, কোনো নদীর স্বচ্ছ ক্রীড়ালহরী সে দেখতে পেয়ে, প্রাণ ভরে তরঙ্গগুলির সঙ্গে খেলা করবার জন্য, গভীর জলে নেমে পড়েছে। নেমে তো পড়ল, কিন্তু তখনি সে ভাবল যে শীতের কাঁপুনি বহুক্ষণ তাকে এই আনন্দ ভোগ করবার জন্য সেখানে থাকতে দেবেনা। তবু যতক্ষণ জলে আছে, সে নিজের মলিনতা কেনই বা দূর করে ফেলবে না? এটা তো সম্ভব, সে তাই-ই করবে।

সর্বপ্রথম জগরামই তার মনে এই রকম চিন্তার উদ্রেক ঘটিয়েছিল। জগরাম যমুনার সম্বন্ধে অপমানসূচক যে-মন্তব্য প্রকাশ করেছিল, তা অজিত সহ্য করতে পারেনি। তার মনে হয়েছিল জগরামকে সেই দিনই পিটিয়ে দেয়। সে এই বিষয়ে সচেতন ছিলনা যে যমুনার প্রতি ভালবাসা তার [অজিতের] মনের মধ্যে লুকিয়ে আছে। জগরামের মতিগতি দেখে তার ভয় হয়েছিল, হয়তো এই শহরে গুণ্ডা তার অনুপস্থিতিতে

যমুনার বাড়িতে উৎপাত করতে পারে। এই কল্পিত উৎপাত প্রতিরোধ করবার জন্য, তখনি সে নিজেকে জীবনমরণ পণ-করা প্রহরীর মতন মনে করে নিল। কিছু দিন পর্যন্ত চোখ-কান খুলে সে সদা সতর্ক ছিল। তার আশঙ্কা ছিল জগরাম, কোন দিন যখন যমুনা একা থাকবে, সেই সময় এসে উপস্থিত হবে। সে যখন আর এলনা, তখন সেই দিনের জগরামের ভীত চেহারা যেন তার চোখের সামনে থেকে থেকে প্রকট হয়ে উঠল। সে ভাবল, জগরাম হয়তো ভাবছে গেঁয়ো মানুষও কেমন গোঁয়ার গুণ্ডা হয়। তার সেদিনকার নিজের সেই আচরণের কথা স্মরণ করে সে মনে মনে লজ্জা বোধ করল। সে ভাবল, ঐ মানুষ তবু ভালো। সে [জগরাম] যে রকম কথা বলেছিল, তার চেয়ে ভাল আর কিছু জানে না। কথা বলেই খালাস, আর কোন ফন্দি মতলব আঁটেনি। আমি নিজের চিন্তার কথা তো বলি। কোন নারী সৎপথে যাচ্ছে, তাকে পথভ্রষ্ট করবার কী অধিকার আমার আছে! এইসব কথা চিন্তা করতে করতে যমুনার এক বিচিত্র রূপের ছবি অজিতের কল্পনায় দেখা দিল। এমন নয় যে সে-ছবি বাস্তব রূপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, কল্পনাতেই জেগে উঠেছিল। সে কল্পনায় দেখল, যেন আবহাওয়া খুব খারাপ, মেঘে মেঘে চারিদিক গভীর অন্ধকার। থেকে থেকে বাজ পড়ার শব্দ, মেঘের এমনি গর্জন যেন এখনি শিলাবৃষ্টি হবে। এমন সময় কোন মহিমময়ী ঘৃত-প্রদীপ নিজের আঁচলে ঢেকে কোন মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কোনো শঙ্কা নাই তার। ঐ আঁচল-ঢাকা প্রদীপের মধুর আলো তার মুখে পড়ছে, যেন ঐ অন্ধকারের ঘন সমুদ্রে বিদ্যুৎই সূক্ষ্ম মাধুর্যে হয়তো প্রকাশ পাচ্ছে। অজিতের ইচ্ছে হল সে কোথাও হতে পুষ্প সংগ্রহ করে ঐ দেবীর উপরে পুষ্পবর্ষণ করে। কিন্তু এই ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই তার অন্তরে এই বেদনা অনুভব করল যে, সে নিজের এই চিন্তানুযায়ী যা করার তা করছে না। যা তার করা উচিত তা করছে না। সে তো এই দেবীকে অপহরণ করবার উদ্দেশ্যে ডাকাতের মতন ওৎ পেতে আছে। কী ভয়ঙ্কর এটা, ও নিজের কৃত্যের কথা ভাবেনা, ভাবে অন্যের কথা। না, নিজেকে ওর পরিবর্তন করা আবশ্যক।

এর পরই হল্লীর পলায়ন। তাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টায় অজিত দিনরাত্রি একাকার করে দিলে। মাঝে মাঝে চিন্তা করে হল্লীকে

ফিরে পেলে সে এখান থেকে সরে যাবে। সে দুর্ব্বলচিত্ত। তার নিজের প্রতি বিশ্বাস নাই যে সে দৃঢ় থাকতে পারবে। নিশ্চয়ই তাকে এখান থেকে সরতেই হবে। কেন সে যাবেনা! পৌরুষের মিথ্যা অভিমানকে সে মনে স্থান দেবে না। সরে যাওয়াতে কি পৌরুষ নাই? যথেষ্ট আছে। এত আছে যে কখনো কখনো পৃথিবীর সকলের সব ত্যাগ ঐ পৌরুষের কাছে ম্লান হয়ে যায়। সংসার-বিমুখীরা সাধারণ মানুষ নয়। তাদের দুর্বল কে বলবে? কে বলবে যে তাদের মধ্যে পুরুষার্থ ছিল না? অজিতের মধ্যে পুরুষার্থ নাই। সে খুবই সাধারণ ব্যক্তি! তবুও এটা ঠিক যে, যদি সে সরে যেতে পারে, যদি মরে যায়, তাহলে সেই চলে যাওয়াটা তার পক্ষে কোন বড় পুরুষার্থের চেয়ে কম হবেনা।

এই রকম অনেক চিন্তা করছিল, এই সময়েই সে-দিন রাত্রিতে যমুনা হঠাৎ তার কাছে ঐ প্রস্তাব করে বসল। এখন ও কি করবে? তবুও কি ও চলে যাবে? না, এখন আর তা ওর দ্বারা সম্ভব নয়। এত শক্তি ওর মধ্যে নাই যে এত বড় ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। যখন ও একাকী থাকে তখন ওর মনে যমুনার কথাই জাগে। যমুনার কথা মনে পড়লে আর কোন কথাই মনে পড়ে না। অন্য সব চিন্তা, বিচার ভুলে যায়। ও কি করবে, ও বিবশ।

কখনো কখনো ওর মনে সংশয় হয়, ভাবে, যমুনার মতের পরিবর্তন হতেও পারে? পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব নয়! প্রতিদিন আদালতে এরকম তো হয়েই থাকে। কেউ যদি দো-মনা অবস্থায় এটা-সেটা কিছু বলেই ফেলে, তাই বলে কি তা পালন করতেই হবে? মামলা-মকর্দ্দমার ব্যাপারে ও দেখেছে যে কোন বিষয় কাগজে-কলমে লিখিত হওয়া সত্ত্বেও, স্বীকৃত হয় না যতক্ষণ না তা আইনত গ্রাহ্য হয়। প্রতিশ্রুতি আইনত গ্রাহ্য হওয়া প্রয়োজন। তাই নিরাশ হয়ে ও বলে, ইংরেজ-শাসিত রাজ্যের এই রীতি খারাপ।

ওর খেদ এই যে আইনত যা ঠিক, ওর নিজের বিচারে তা ঠিক নয়। ভালর চেয়েও ভাল মনে করে অনেক বিপরীত কাজ নিজেই ও করে। ভাবে, দেবতাও মানুষের রূপ গ্রহণ করে মানুষের কল্যাণের জন্য আসেন। তাঁরা ছদ্ম রূপ নেন এই জন্যই কি তাঁরা অসৎ? না, তাঁরা অসৎ নন।

মনুষ্যরূপে তাঁরা সৎএর চেয়েও কিছু বেশি! এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সে মনে মনে নিজেই মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হল। যমুনা তো মূর্খ নয়, যে এই বিষয়টা বুঝতে পারে না। সে যদি মত পরিবর্তন করে কে তাকে বাধা দেবে?

না, যমুনা এমন মূর্খ নয়। সে আমার চেয়েও উন্নত! আমি কত বার তাকে বলেছি—মতিলালের কাগজপত্রে মনে হচ্ছে ভেজাল আছে। সে স্পষ্ট ভাবে অস্বীকার করুক,—কারও কাছে আমার দেনা নাই। তবু সে আমার কথা মানল না। কেমন করে সে মানবে? কোন রকমে মেনে নেবার পাত্রীই সে নয়, মেনে নেবার মতন ধাতু দিয়ে সে তৈরি নয়। সে রত্ন, রত্নই। সে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারে, ভেঙেচুরে যেতে পারে, কিন্তু সে এমন ধাতু নয় যে আগুনে তপ্ত করে গলিয়ে যেমন ইচ্ছে তেমন ভাবে ছাঁচে ঢালাই করে নেওয়া যায়। তার এই কুয়া হাতছাড়া হবে—হোক। এখনি হোক, তার এর তোয়াক্কাই বা কি? তার ঘর-বাড়ী নীলামে উঠুক, এখনি উঠুক, এর জন্য তার কিসের ভয়? তার কাছে সব চেয়ে বড় এমন একটা জিনিস আছে যা অমূল্য। সেটা তার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারে না! ভয় দেখিয়ে, ধমক দিয়ে, লোভ দেখিয়ে কেউ তাকে বশ করবে, এটা অসম্ভব। সে নিজের কথা লঙ্ঘন করবে না।

এই রকম অনেক চিন্তাই অজিত করে। তবু সে তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে চায় না। যে-ক্ষেত্রে কাগজে-কলমে কোন বিষয়ে গলদ থাকে, সেরূপ অবস্থায় পাওনাদারকে শান্তভাবে কাজ উদ্ধার করতে হয়। এমন কিছু করতে নাই যাতে বিশ্বাসী দেনাদারের মনে কোন রকমের খটকা বাধে।

আজ যখন সে যমুনার বাড়ী গেল তখন যমুনা বসে থালায় শস্যের বালি-কাঁকর বাছছিল। তাকে দেখে কোন কথা না বলে যমুনা মাথায় কাপড় দিল। মাথায় কাপড় দেওয়ার মানে আগন্তুক পুরুষের প্রতি মৌন নমস্কার। সেদিকে কোন দৃষ্টি না দিয়ে অজিত হল্লীর দিকে তাকিয়ে বলল, আমার সঙ্গে কেউ কথা বলছেনা, আমি চললাম।

মায়ের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে হল্লী এক তা ব্লটিং পেপার কিনে এনে ছিল। তার থেকে কিছু অংশ কেটে রেখে বাকী অংশ একটি অন্ধকার

তাকে লুকিয়ে রাখল এই ভয়ে যে রাধে কিম্বা হীরালাল কিম্বা অন্য কেউ দেখে ফেললে নিশ্চয়ই চাইবে, ছাড়বে না। তাকে ওটিকে রেখে সে দৌড়ে এসে অজিতকে জড়িয়ে ধরে বলল, কোথায় যাবে কাকা, আমি তো আজ তোমাকে ধরবার মতলবে ছিলাম।

বেশ, ধর, আমি দৌড়ে পালাচ্ছি। দেখি, কেমন করে ধর।

বেশ কথা। দৌড়াও দেখি! আমি পালাতে দেব না। বাজি রেখে দেখ।

বাজি রাখবে? বাজি রাখার মতন পয়সা আমার কাছে নাই। বুঝেছি, মেঠাই খাবার ফন্দী এঁটেছ। ভাবছ—এই বুড়ো মানুষ আমার সঙ্গে দৌড়ে কি আর পারবে। না ভাই তোমার সঙ্গে বাজি ধরব না।

না তুমি বুড়ো নও, কই একটি চুলও তো পাকেনি।

চুল না পাকলেও বুড়ো হয়। তোমার মায়েরও তো চুল পাকে নি। তবু কি তিনি বুড়ী নন! ওঁকে জিজ্ঞেস করে দেখ।

বিরক্ত হয়ে হল্লী বলল, আমার মাকে বুড়ী বোলনা কাকা। বুড়ীদের আমার ভাল লাগে না। সব সময় ক্যাঁক্-ক্যাঁক্—খ্যাঁক্-খ্যাঁক্ করে।

যমুনা হেসে ফেলল। বলল, বিজয়রামের দিদিমার উপরে হল্লীর খুব রাগ। তাঁকে সব ছেলেরা মিলে ক্ষ্যাপায়। হ্যাঁরে, আমি যখন বুড়ী হব, তখন ঐরকম আমার সঙ্গেও করবি নাকি?

অজিত কিছু বলতে চাইছিল, তার পূর্বেই হল্লী বলে উঠল, না, মা তুমি কখনো অমন হবে না। উনি তো সব সময় ছেলেদের কামড়াতে ছুটে আসেন।

আচ্ছা, বিজয়রামের দিদিমার দাঁত আছে? অজিত জিজ্ঞেস করল।

দাঁত থাকলে তো আমাদের কারও আর রক্ষে ছিল না। এইবার দৌড়ে দেখ।

বাজে কথা। আমি দৌড়াতে পারি না। বসে বাজি ধরে দেখ কে কতক্ষণ বসে থাকতে পারে।

এই প্রস্তাবে হল্লী রাজী হয়েছে দেখে অজিত বলল, এখানে বসলে তোমার মা বিরক্ত হবেন। চল নিম গাছের তলায় বাইরে বসা যাক।

এইখানেই বসো। মা বিরক্ত হবেন না।

হবেন। উনি তো আমাকে বসতেও বলেন নি।

বিরক্ত হবে মা ?

যমুনা মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জানাল বিরক্ত হবে না।

দেখলি হল্লী, উনি মাথা নেড়ে জানালেন যে বিরক্ত হবেন।

হল্লী আবার দৌড়ে মায়ের কাছে গিয়ে তার কাঁধের উপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করলে, মা, বিরক্ত হবে ?

কেমন ছেলেমানষি করছিস্। বলেছি তো বিরক্ত হব না।

অজিত রোয়াকে বসতে বসতে বলল, তুমি বলেছ বলেই তো বলেছেন বিরক্ত হন নি, কিন্তু বিরক্ত হয়েছেন।

ইতিমধ্যে যমুনার থালার শস্যের কাঁকর বালি বাছার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। উঠে সে ভিতর-ঘরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সে দড়ি-কলসী নিয়ে কুয়ো থেকে জল আনতে যাচ্ছে।

অজিতও উঠে দাঁড়াল।

[২২]

দ্বিতীয় দিন আসবার জন্যে হল্লীর কাছ থেকে অজিত নিমন্ত্রণ পেয়েছিল। বলা শক্ত এই নিমন্ত্রণ ব্যতীত সে আসত কিনা। যা হোক, দ্বিতীয় দিন সে এসে উপস্থিত হল। প্রথম দিনের মতই যমুনা এবং হল্লী দুজনেই বাড়ীতে ছিল। সে এই ভেবে খুশী হল যে শুভ মুহূর্তেই এখানে আসবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছিল।

সে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ হল্লী ? আজ দেখব কে হারে।

হল্লী বলল, কাল তুমি হেরে গিয়েছিলে। আজ কিন্তু বাজি ধরতে হবে।

অজিত বলল, বাজী ধরবার মতন টাকা-পয়সা আমার কাছে নাই। কবে আমি হেরেছিলাম ? আজ অন্য রকমের বাজি ধরব, যদি তুমি বল।

হল্লী বলল, অন্য রকম কেমন ?

অন্য রকম এই যে, বাজি ধরে তুমি যদি হেরে যাও তা হলে আমি তোমাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাব।

না, আমি মাকে ছেড়ে থাকতে পারি না।

আর আমি যদি হেরে যাই তাহলে তোমাদের বাড়ীতে এসে থাকব। আমি কাজ-কর্ম কিছুই করবনা, বিনি পয়সায় তুমি আমাকে খেতে-পরতে দেবে।

বেশ কথা। তুমি আমাদের বাড়ীতে এলে সারারাত তোমার কাছে গল্প শুনতে পাব। তোমাকে ঘুমোতে দেব না।

তোমার মাকে জিজ্ঞেস কর। তিনি আমাকে মেরে তাড়িয়ে দেবেন না তো?

না, না, এটা এক রকমের জুয়া খেলা। অর্জুন জুয়া খেলেছিলেন, তার ফলে তাঁকে বনে বাস করতে হয়েছিল। মা বলেছিলেন। বলো দেখি মা, এটা জুয়া খেলা নয় কি?

যমুনা কোন উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে বসে থালার আনাজ বাছতে লাগল। অজিত বলল, দেখ উনি বলছেন জুয়া নয়।

হল্লী বলল, এসব কথা ছাড়। মায়ের কাছে গত কালকের বিষয় মীমাংসা করিয়ে নাও। আচ্ছা, মা কাল কার জয় হয়েছিল?

যমুনা বলল, আমি জানি না।

অজিত বলল, তুমি জানবেনা কেন? তুমি সব জান। তোমাকে বিচার করতে হবে। আমি জানি তুমি অনুচিত কিছু বলবে না। তুমি যা বলে ফেল তার নড়-চড় হয় না। যতই তোমার ক্ষতি হোক, দুঃখ হোক, ভাল মন্দ হোক, যাই-ই হোক না কেন, যে-কথা দাও তা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা কর। ঠিক বলছি কিনা হল্লী?

খুশী হয়ে হল্লী বলল, ঠিক বলছ।

অজিত বলল, তুমি ঠিক জবাব দিলে না। যে-কথা উনি বলেন সেটা রাখেন কিম্বা রাখেন না, তাই বল।

মা কখনো মিথ্যে কথা বলেন না। উনি হীরার মতন নন।

যমুনা বলল, হল্লী হীরাকে ভোলে না। আবার কোথাও ঝগড়া না বাঁধিয়ে বসে।

হীরা এমনি যে তার সঙ্গে চরম কিছু যদি না ঘটে, তাহলেই রক্ষে।

না, কাকা, এখন সে ভাল হয়েছে। আর সে আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে না।

এই প্রসঙ্গ ছেড়ে অজিত হল্লীকে জিজ্ঞেস করল, আজ মোহন্তের বাগানবাড়ীর দিকে তোমাকে যেতে দেখেছিলাম! খেলা করতে যাচ্ছিলে?

খেলা করতে যাচ্ছিলাম না। ছেলেরা বলাবলি করছিল, ওখানে একটা বাঘিনী এসেছে।

যমুনা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, তোর সেখানে যাবার কি দরকার ছিল?

বাঘিনী কোথায়? ছেলেরা বাজে কথা বলছিল। বলছিল দূরে এক গ্রামে চম্পা ধোপানী আছে। সেই-ই বাঘিনী হয়ে আশেপাশের গ্রামে ঢুকে মানুষদের ধরে খেয়ে ফেলে। আমি বললাম, চল—আমি দেখব কেমন বাঘিনী।

অজিত জিজ্ঞেস করল, ধোপানী কেমন করে বাঘিনী হল?

ছেলেরা বলে চম্পার স্বামী কলকাতায় গিয়ে সেখানকার জাদু বিদ্যে শিখে এসেছিল। বাড়ী এসে সে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে আর একটি ধোপানীকে বাড়ী নিয়ে এল, এইজন্য চম্পা খুব রেগে গেল। আর সেই নূতন ধোপানীকে মেরেধরে তাড়িয়ে দেবার মতলব করল। এই জন্য ধোপা কি একটা মন্ত্র-তন্ত্র পড়ল। সে ভেবেছিল মন্ত্রের জোরে চম্পাকে পাখীতে রূপান্তরিত করে দিলে চম্পা উড়ে চলে যাবে। কিন্তু সে মন্ত্রে-তন্ত্রে কিছু ত্রুটী করে ফেলল। ফলে চম্পা পাখী হল না, হয়ে গেল বাঘিনী। বাঘিনী হয়েই তৎক্ষনাৎ চম্পা ধোপানীকে সাবাড় করল, তারপরই ধোপার উপরে ঝাপিয়ে পড়বার উপক্রম করতেই—ধোপা দৌড়ে পালিয়ে গেল। এখন পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। যতদিন সে আবার চম্পার মাথায় হাত রেখে মন্ত্র-তন্ত্র না পড়বে ততদিন চম্পা বাঘিনী হয়েই থাকবে। কিন্তু এটা কেমন করে সম্ভব হবে? ধোপা তার কাছে ঘেঁষলেই তো বাঘিনী তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে মেরে ফেলবে। যেমন বদ ধোপা, তেমনি তার শাস্তি ভোগ করছে। ভগবান তার—

যমুনা বলল, এসব কি বিশ্রী কথা বলছিস?

হল্লী বলল, আমি কি বলছি? ছেলেরা বলছিল। নিছক ব্যঙ্গ, কেউ তৈরী করে চালু করে দিয়েছে। ছেলেরা ভেবেছিল আমি ভয় পাব। এমন ভয় আমার নাই। গিয়ে চারিদিক ঘুরেফিরে এলাম—বাঘিনীর

ছায়াও নজরে পড়ল না। নজরে পড়বে কেমন করে, ব্যাপারটা সত্যি হলে তো? তবু কাকা, এটা গল্প হলেও শুনতে কিন্তু বেশ লাগে।

অজিত বলল, বাঘিনী বুদ্ধিমতী! এমন নয় যে পতি যতই না কেন খারাপ কাজ করুক, তবু তার নামের মালা নিয়ে বসে জপ করবে। খুব বাহাদুর ধোপানী! তুমি ভাল গল্প শোনালে।

হল্লী বলল, বেশ ভালই হত যদি বাঘিনী নিজের ধোপাকেও সাবড়ে দিত। লোকটা খুব খারাপ ছিল।

অজিত বলল, এর চেয়েও খারাপ কি আর হয়? যে নিজের ঘরের মানুষকে কষ্ট দেয়, তার মুখোদর্শন করতে নাই।

হল্লী বলল, আমি ভাবি যদি এই ব্যাপার সত্য হত! আর চম্পা সত্যিই বাঘিনী হয়ে নিজের স্বামীর উপরে—

যমুনা তাকে বাধা দিয়ে শাসনের স্বরে বলল, চুপ করবি কিনা বল? খবরদার, ফের যদি কখনো এইরকম কথা তোর মুখ থেকে শুনি।

হল্লী হতবাক হল। সে বুঝতে পারেনি তার এই সব কথায় খারাপ কি আছে। সে তো ভেবেছিল মাকে এসে যখন এই সব কথা বলবে, তখন উনি শুনে খুশী হবেন। বাঘিনীকে দেখতে গিয়ে সত্য-মিথ্যা জেনে আসবার জন্য কোন ছেলেই প্রস্তুত ছিল না, তখন হল্লীই এগিয়ে গিয়েছিল। তার মনে একটুও সন্দেহ ছিলনা যে এই কথা শুনে মা এতই খুশী হবেন যে আনন্দে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবেন। কিন্তু মায়ের এই কথা শুনে সে কিছুক্ষণ চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল।

হল্লীর পক্ষ নিয়ে অজিত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, ছেলেকে কেন শাসাচ্ছ? সে এমন কি কথা বলেছে যে এত বিরক্ত হচ্ছ? এই ভাবে তাড়না করে করে তো একবার তাকে বাড়ীছাড়া করেছিলে, আবার—

যমুনা বলল, আবার পালাতে চায় তো পালাক। আমি বুঝব, যতক্ষণ আমার ছিল, আমার সঙ্গেই ছিল, তারপর যা অদৃষ্টে আছে হবে। কিন্তু আমি এটা পছন্দ করি না যে, ও এখন থেকেই অন্যের নিন্দে করতে শেখে। আমি তোমার পায়ে পড়ি, এখন থেকেই ওকে এই রকম শিক্ষা দিয়ে নষ্ট কোরনা।

আমি ওকে শিখিয়েছি?

তুমি ওকে শেখাও নি, কিন্তু অন্য কোন উদ্দেশ্যে ওকে কেন প্রশ্রয় দিচ্ছ? তোমার কিছু বলার থাকে সোজাসুজি আমাকে বল। আমাকেই বল,—কী চাও? ছেলেদের মুখ থেকে যা-তা কথা বলিয়ে ওদের মন দূষিত করা ঠিক নয়।

অজিত যমুনাকে বুঝাবার চেষ্টা করল এই বলে—এতে ছেলের মনকে দূষিত করবার কী আছে যমুনা? ছেলেমানুষ, কত রকমের কথা তাদের কানে আসে। ওদের তো আর সিন্দুকে বন্ধ করে রাখা যায় না।

রাখা না গেলেও এই সব কথা ছেলেদের মুখ দিয়ে বলানো অনুচিত। কে জানে কখন কার অনিষ্ট ঘটে।

তোমার সব কথা উল্‌টো ধরণের। কারও কথায় কি কারও অনিষ্ট হয়? তাই যদি হতে শুরু হয়, তাহলে সংসারে, কলেরা, মহামারীর প্রয়োজন থাকবে না। যমরাজকে কিছু করতে-টরতে হবে না, আর—

আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। তুমি আমার যে উপকার করেছ, তা ভুলিনি আমি। আমি তোমার অধীন। আমাকে কাটতে-কুটতে চাও, যা করতে চাও কর, কিছু বলব না আমি। হাত জোড় করে তোমাকে বলছি কারও অমঙ্গল চিন্তা কোরনা। কে তোমার কি ক্ষতি করেছে?

আর কিছু না বলে যমুনা নীরবে সেখান থেকে উঠে গেল।

[২৩]

অন্য ছেলেদের সামনে হীরালাল এই কথা মেনে নিল যে হল্লী যে রকম জগদম্বার মেলা দেখে এসেছে, সে রকমটি সে দেখতে পায়নি। না সে সেখানে না রাসলীলাওয়ালাদের দেখেছিল না হিন্দোলা-ওয়ালাদের। এবার যেমন ভিড় হয়েছিল এমন ভিড়ও সেবারকার মেলায় হয়নি—এই সত্য উক্তির জন্য হীরালালের প্রতি হল্লীর ভাল-বাসা বেড়ে গেল। এমন কি একদিন হল্লী তার সচিত্র দিন-পঞ্জিকা কিছু দিনের জন্য তাকে দিতেও চাইল, কিন্তু হীরালাল বলল, এইখানেই থাক, যদি কোন দিন তারিখ জানবার হয় এখানেই এসে দেখে যাব।

হল্লীর সঙ্গে সে-দিন দেখা করতে এসে সে দেখল বাড়ীতে যমুনা নাই। আর আশে-পাশে কোথাও হল্লীরও দেখা পেল না, ভাবল হয়তো কোথাও খেলা করতে গেছে, এই ভেবে সে ফিরে যাবার উপক্রম করছে এমন সময় ডাক-পিওনকে আসতে দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ডাক-পিওনকে থামতে দেখে সে জিজ্ঞেস করল, যমুনা কাকীর কোনও চিঠি আছে কি? উনি কোথাও কাজে গেছেন, আমাকে দাও, আমি দিয়ে দেব।

দেখো, যেন হারিয়ে না যায় ভাই, তাঁকে দিয়ে দিও—এই বলে সে একটি খাম তার হাতে দিল।

খামটি নিয়ে হীরালাল দেখল ঠিকানা সাধারণ মানুষের হাতের লেখা। সম্পূর্ণ লেখাটি পড়তে পারা তার পক্ষে বিশেষ কৃতিত্বের বিষয় ছিল না—কেননা তার নিজের হাতের লেখা এই লেখার চেয়েও খারাপ। কিন্তু খামের উপরে প্রেরকের নাম বৃন্দাবন দেখে সে চমকে উঠল, আরে, এ চিঠি তো হল্লীর বাবার!

খামটা নিয়ে সে একান্তে সরে পড়ল। খুলে চিঠিটা পড়ল। দূরের কোন হাসপাতাল থেকে যমুনাকে লেখা চিঠি—

"কত বছর পরে লিখছি। ক্ষমা কর। মন শান্ত ছিল না। আজ কোন রকমে মনকে স্থির করে লিখতে বসেছি। জানিনা, এই পত্র পাবে কি পাবেনা। তুমি কোথায় আছ, ছেলেটি কোথায় আছে, কেমন আছ, কি করছ, এসব আমি কিছুই জানি না। তবু লিখছি। ভগবানের যেমন ইচ্ছা।

দ্বারকানাথ থেকে ফেরার পথে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম, এই হাসপাতালেই সব শেষ হয়ে যাবে, কেউ জানতেও পারবে না। কিন্তু ভগবানের দয়ায় এখন উঠে হাঁটতে পারি। পত্র পাওয়া-মাত্রই দশ টাকা যদি পাঠাতে পার, পাঠিও। একবার জন্মভূমি আর তোমাদের সবাইকে দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে। বাকী সব কথা ওখানে গিয়েই বলব। ভগবান যদি ইচ্ছে করেন তাহলে সব শুনে তুমি ক্ষমা করবে।"

চিঠির নিচে হাসপাতালের কক্ষ, ইত্যাদির সব ঠিকানা দেওয়া ছিল।

হীরালাল এই চিঠিটি যমুনাকে দেবার নানা রকমের উপায় চিন্তা করতে লাগল। প্রথমে ভাবল, যমুনা কাকীকে এমন সময়ে দেব যখন সেখানে হল্লী থাকবেনা। উনি পড়তে পারেন না, আমাকে পড়ে শোনাতে বলবেন। আমি যা ইচ্ছে তাই পড়ব। বলব—নোটিসের চিঠি, কারও কাছ থেকে তুমি এক হাজার টাকা নিয়েছিলে, তারই নোটিস্। না, এটা বলব না। বলব তোমার মামাবাড়ীর চিঠি; তোমার যে ছোট মামা এবার এসেছিলেন, তাঁর মৃত্যুসংবাদ। খুব করে কাঁদাব। যদি সেই সময় হল্লী এসে পড়ে, তাহলে চিঠি নিয়ে পালিয়ে যাব, তাকে চিঠি দেখতে দেব না। আর, অজিত যদি এসে পড়ে. তখন? অজিতের কথা মনে পড়তেই হীরালালের চেহারা বদলে গেল। অজিতের ব্যবহারে সে অসন্তুষ্ট ছিল। সে মনে মনে বলল—কী দুষ্টু অজিত, আমার দিকে এমন করে তাকায় যেন খেয়ে ফেলবে। হল্লী আমার গায়ে ঢিল ছুড়ল, আর আমার প্রতিই অজিতের বিরক্তি। ও অতি বদ, আর হল্লী এবং তার মা অজিতের কথানুসারেই চলে। বোঝা কঠিন ভিতরের কাণ্ড-কারখানা কি! সে দিন হল্লীর মা তার পা ছুঁয়েছিলেন। সাধু-সন্ত হয়েছে! দেখে নেব।

এই সময় তার মনে পড়ে গেল যে হল্লী মায়ের নাম দিয়ে মিথ্যে চিঠি লিখে দিন-পঞ্জিকা আনিয়েছিল। সেই-ই বা কেন ঐ রকমের যা-হোক একটা জবাব লিখে দেবে না।

সেই দিন-ই বাবার সঙ্গে তার এক জায়গায় কুটুম্বদের নিমন্ত্রণ করতে যাবার কথা ছিল। ঘরের ভিতরের কাগজের একটি থলের থেকে চুপি-চুপি একটি শাদা খাম বার করে নিয়ে এল এবং চটপট যমুনার হয়ে বৃন্দাবনকে এই মর্মে চিঠি লিখল—“অনেক দিন হল হল্লী মারা গেছে। আমার কাছে তুমিও মৃত। আমি অজিতের সঙ্গে ঘর করছি। এখানে আর তোমার আসবার প্রয়োজন নাই। ভিক্ষে করলে অনেক টাকা পাবে। আমি বেশ ভালই আছি। ভগবানের কাছে তোমার শুভ কামনা করি।”

চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে বাড়ী ফেরা-মাত্র দেখল কুটুম-বাড়ী যাবার জন্য গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। কোন বন্ধুর কাছে এই কারসাজির কথা বলবার

জন্য তার মন ছটফট করছিল, কিন্তু সময় ছিলনা। বাপের সঙ্গে তাকে তৎক্ষণাৎ গাড়ীতে উঠতে হল।

বৃন্দাবনের লিখিত পত্র হীরালালের পকেটে ছিল, হঠাৎ সেটা তার বাপের চোখে পড়ল।

[২৪]

কয়েকদিন ধরেই যমুনা সেই কথার বিষয়ই চিন্তা করছিল সে-দিন রাত্রিতে অজিতকে সে যে কথা দিয়েছিল, আজ অবসর বুঝে সে বলল, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

অজিত বলল, আমিও কিছু বলতে চাইছিলাম। এইবার মতিলাল চৌধুরী একটা কিছু করবে। কয়েক দিন ধরেই আমি ভাবছি যে কোন একটি ভাল উপায় যদি বার করতে পারা যায়, আর তুমিও যদি মন শক্ত করতে পার, তাহলে কাজ উদ্ধার হয়।

যমুনা স্থির করতে পারেনি, নিজের কথা কেমন করে বলবে। সে যথেষ্ট চিন্তা করছে—বিচার করেছ। বিচার করার পর সময়ের জন্য প্রতীক্ষাও কম করেনি, তাইতো আজ এমন করে এইটুকু বলতে পেরেছে। তার মনে দ্বন্দ্ব ছিল। যতটা সে নিজের কথা বলতে চাইছিল ততটা বলতে পারছিল না। অষ্টমীর রাতের আলো আর অন্ধকারের মতন, দ্বন্দ্বের এই 'হ্যাঁ' আর 'না' এই দুয়ের প্রভাব ওর মনে একাকার হয়েছিল। বুঝতে পারা সহজ ছিলনা যে তার কাছে মুখ্য ছিল কোনটা—হ্যাঁ, কিম্বা না, তার অষ্টমী শুক্লপক্ষের অথবা কৃষ্ণপক্ষের।

অজিত উঠে দাঁড়াল। যমুনা বলল, বসো, আমার কিছু কথা আছে।

বলবার কথা আছে, কিন্তু বলতে পারা যাচ্ছে না। কথার উপরে যেন পাথর চেপে তার প্রবাহকে আটকে রেখেছে।

চলে যাবার জন্য উদ্যত অজিত বলল, আমাকে এখনি যেতে হবে। আবার আসব। মতিলালের সঙ্গে দেখা করে ঠিক করে নেব কি করা উচিত। এই বলে সে যাবার জন্য এগোল।

যমুনা রাস্তা আগলে সামনে দাঁড়াল, বলল, অন্য কথা আছে, বসো।

অজিতের গায়ে যমুনার শাড়ীর আঁচলের একটু ছোঁয়া লাগল। সহসা সে তার রোমে-রোমে সেই আঁচলের শিহরণ অনুভব করল। এ কী হল, সে যেন অবশ হয়ে পড়ল। যে-বিষয় সে স্থির করে ফেলেছিল তাতে আর দৃঢ় হয়ে থাকার শক্তি তার আর নাই। যেন পরাজিত হয়েই সে বলল, বল, কি বলবে।

যমুনা বলল, বসবার মতন সময় কি নাই?

সে বসে বলল, এই বসলাম। রাগ কোরনা।

কথার অন্যথা হবেনা তো?

না, অন্যথা হবেনা।

অন্যথা হবেনা?

এটা তো আমি চিন্তাই করিনি। কিন্তু ঐ কথা যদি আমার আয়ত্তাধীন না হয়, তাহলে?

তেমন কিছু নয়। আমার ভরসা আছে।

তাহলে আমি কথা দিচ্ছি। তুমি যা বলবে তা রক্ষা করতে পিছ-পা হব না। কিন্তু আজ কিছু বোলনা। আমায় নিজের মন স্থির করতে দাও।

ভয় পেয়োনা, তোমায় ধাপ্পা দেবনা।

তবুও আজ নয়। কি জানি কেন আমার ভয় হচ্ছে। আমার নিজের প্রতি ভরসা নাই।

বাইরে হল্লী ডাকল, মা।

অজিত বলল, দেখ, হল্লী স্কুল থেকে এসে পড়েছে। ওর কথাই আমি ভাবছিলাম! সে ছেলে মানুষ, কিন্তু আজকালকার ছেলেরা আর ছেলে মানুষ নয়। তারা অনেক বিষয় বোঝে।

যমুনা গম্ভীর হয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে হল্লী এসে জিজ্ঞেস করল, অজিত কাকা এসেছিলেন?

অন্যমনস্ক ভাবে যমুনা বলল, হ্যাঁ। কি জন্যে এসেছিলেন—হল্লী জিজ্ঞেস করল। কিন্তু কোন উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে তক্ষুনি কি একটা খুঁজতে লাগল। এক জায়গায় কাপড়ের একটা বল পড়েছিল, সেটাকে নিয়ে এমনভাবে বেরিয়ে পড়ল যেন কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে।

হল্লীর রকম-সকম দেখে যমুনা চমকে উঠল। তার কাছে স্পষ্ট হয়ে

উঠতে লাগল যে কিছুদিন ধরে অজিতের প্রতি হল্লীর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে।

রাত্রিতে খাবার সময় এসে হল্লী জিজ্ঞেস করল, মা, তোমার কাছে কি কোন চিঠি এসেছে ?

আমার কাছে কার চিঠি আসবে রে ?

আমি জিজ্ঞেস করছি যদি এসে থাকে। তোমার মন ভাল নাই মনে হচ্ছে।

চিঠি এলে কি আমি পড়তে পারতাম ? তোকেই পড়ে শোনাতে হত।

আমার অনুপস্থিতিতে হয়তো হীরা এসেছিল, তাকে দিয়েই চিঠিটা পড়িয়ে লুকিয়ে রাখনি তো ? সত্যি করে বলো মা, কোন চিঠি এসেছি কি ?

হল্লীর ব্যকুলতা দেখে যমুনা শঙ্কিত হয়ে উঠল। বলল, না বাছা, কোন চিঠি আমার কাছে আসেনি। এলে তোর কাছে গোপন রাখব কেন ?

কোন মন্দ খবর তুমি আমাকে শোনাতে চাওনা। আমার দিব্যি মা, আমার কাছ থেকে গোপন কোর না। আমি কাঁদব না !—বলতে বলতে এমন মনে হল যেন সে কেঁদেই ফেলবে।

আমি কোন চিঠি লুকিয়ে রাখিনি। কোন মন্দ খবর···?

বাবার সম্বন্ধে কোন দুঃসংবাদ হয় তো আছে, তাই তুমি চাও যে তা যেন আমি জানতে না পারি।

আমার কাছে চিঠি এসেছে কে তোকে বলল ?

যমুনার বিস্ময়-ভাব দেখে হল্লী নিশ্চিন্ত হল। সে স্বস্তির হাঁপ ছেড়ে বলল, তাহলে মিথ্যে ! রাধে আমাকে ভয় ধরিয়েছিল। আমি ভাবছিলাম তেমন কিছু হয়ে থাকলে তুমি আমাকে নিশ্চয় বলতে।

ছেলেরা কখনো কখনো বাপ ফিরে না আসার বিষয় নিয়ে নানারকম কথা তৈরী করে হল্লীকে ক্ষ্যাপায়, এই কথা ভেবে যমুনা নিশ্চিন্ত হল। সে কোন কারণে ব্যস্ততার জন্য, আর কিছু জিজ্ঞেস না করে চট করে ছেলেকে খাবার বেড়ে দিল।

দ্বিতীয় দিন রাধের কাছে হল্লী শুনল যে নিমন্ত্রণ সেরে হীরা ফিরে এসেছে। এই শুনে সে বলল, ফিরে এসেছে তবু আমার সঙ্গে কেন দেখা করেনি।

রাধে বলল, সে যে জমিদার, এই অহঙ্কার তার আছে। ভালই হয়েছে সে এখানে আসেনি। সে যখন আসে তখন আমার এই ভয় হয় যে কোন জিনিস না গাপ করে দেয়।

কিছুক্ষণ পরে খেলার মাঠে সে হীরাকে দেখতে পেল। কিন্তু হীরা হল্লীর দিকে তাকালও না।

হল্লী এগিয়ে গিয়ে বলল, অনেক দিন কাটিয়ে এসেছ, কবে এলে হীরা?

কাল—বলে সে অন্যদিকে চলল, হল্লী তাকে অনুসরণ করছে দেখে সে বলল, আমার বাবা রাগ করেন।

কি জন্য, খেলার জন্য? তা যদি হয়, এসো, চলো আমার বাড়ী। সেখানে নিরিবিলিতে দুজনে এক সঙ্গে বসে পড়ব। আমি ভূগোল পড়ব, তুমি অঙ্ক-কষা শিখো।

হীরালাল বলল, বড় ভূগোলের বইতে একটা জায়গার ঠিকানা আমাকে দেখতে হবে। সেখানে হাসপাতাল আছে।

ভূগোলে তো হাসপাতালের নাম লেখা নাই। ম্যাপে রেল-লাইন চিহ্নিত করা আছে,—হাসপাতালও থাকা উচিত ছিল।

এর মধ্যে হঠাৎ রাধে বলে উঠল, আর সেই চিঠি?

হীরা রেগে তার দিকে ফিরে বলল, কিসের চিঠি? আমি জানি না। আমার বাবার কাছে হয়তো এসে থাকবে। আমি কি জানি? ঘরের কথা যাকে-তাকে বলতে নাই।

রাধে বলল, তোমার ঘরের কথা চুলোয় যাক। আমি তো চিঠির কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম।

হীরা বিরক্ত হয়ে বলল, শুনলে হল্লী, এর কথা? এই জন্যেই তো— এই রকম খারাপ ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতে বারণ করেন বাবা।

রাধে বলল, আর তুমি বড় ভাল ছেলে! চল্ হল্লী আমরা আলাদা খেলা করি।

রাধের এই ব্যবহার হল্লীর ভালো লাগেনি। সে বলল, চিঠির বিষয় নিয়ে রাধের জ্বালা ধরেছে।

হীরা এগিয়ে যেতে যেতে থেমে গেল। উৎসুক হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, কেমন চিঠি?

বলছিল মায়ের কাছে একটা চিঠি এসেছিল। তিনি সেটা আমাকে না দেখিয়ে তোমাকে দিয়ে পড়িয়ে নিয়েছেন। তুমি তো অন্য জায়গায় ছিলে, এখানে কেমন করে তখন আসবে? এটা একেবারে মিথ্যে।

হাত তালি দিয়ে হীরা বলল, মিথ্যে নয়, সব সত্যি। জাদুর জোরে অন্যের চিঠি আমার হাতে এসে পড়ে, জাদুর জোরে আমি সব কিছু করতে পারি!

সব ছেলেরা হো-হো করে হেসে উঠল।

লজ্জিত হয়ে রাধে বলল, আমি এই কথাই শুনেছিলাম, হয়তো তা মিথ্যে।

হল্লী বলল, শোন রাধে, আমি বলছি, তুমি মিথ্যে শোননি। জগদম্বার মেলা হতে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম। আমি এখানে ফিরে আসবার দ্বিতীয় দিনে চিঠিটা এখানে এসেছিল। ঐ চিঠি নিয়ে হীরা মাকে বলতে গিয়েছিল যে হল্লীর চিঠি এসেছে; সে শীঘ্রই আসবে, তুমি কোন চিন্তা কোরনা। তাই না? অনর্থক আমরা পরস্পর ঝগড়া করছিলাম।

এর পর সন্তুষ্ট চিত্তে সব ছেলেরা খেলার মাঠের দিকে এগিয়ে চলল।

[২৫]

রাধে এসে হল্লীকে বলল, তুমি আমাকে ভুল বোঝাচ্ছিলে, আমার কথাই সত্য।

সে জিজ্ঞেস করল, কি কথা, চিঠির কথা? মায়ের কাছে চিঠি এসেছে কি?

এসেছে।

মায়ের প্রতি হল্লীর মনে কোথাও কিছু সন্দেহ বাড়ছিল। এই জন্যই সে জোরে প্রতিবাদ করে বলতে পারলনা যে আমি মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করেছি, এমন হতে পারে না। সে বলল, তাহলে কি রকম করে জানা যায়? অজিত কাকা হয়তো জানেন।

উনি জানেন, কিন্তু তোমাকে বলবেন না। হল্লী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। তার মনে পড়ে গেল কিছুক্ষণ পূর্বে সে কোথাও যাচ্ছিল, সেই সময়ে

একজন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার বাবার কোন খবর এসেছে? তখন এই প্রশ্নের প্রতি কোন মনোযোগ না দিয়েই মাথা নেড়ে গন্তব্য পথে সে এগিয়ে ছিল। এখন সে ভাবল, চিঠি নিশ্চয়ই এসেছে। কথা যখন উঠেছে, তখন আর মিথ্যে হয় কি করে?

রাধে বলল, হীরাও জানে। সেই লোকটা জানে, অজিত জানে, হীরাও জানে; জানেনা শুধু হল্লী। এটা বড় লজ্জার কথা! মাথা নেড়ে হল্লী বলল, হীরা বদমাস, তার কথার কি কোন ঠিক আছে। সে তো বক-বকই করে। বাচাল!

হল্লীকে সমর্থন করে রাধে বলল, তার কথার কোন ঠিক নাই। সে বলছিল হল্লীর ক্ষেত, আমের গাছ আর ঘর-দোর নীলামে চড়াব আর ওকে গ্রাম থেকে বার করে দেব। ওর কাছে আমার অনেক টাকা পাওনা আছে। চিঠি এসেছে ওর বাবার, সে মরে গেছে। আমার বাবা এবার আর ছাড়বেন না। আমরা সকলে হীরাকে জিজ্ঞেস করলাম —হল্লীর বাবা যদি মরেই গেছেন তাহলে চিঠি কেমন করে লিখলেন? অমনি সে সরে পড়ল, সরে না পড়লে আমরা ওকে না ঠেঙিয়ে ছাড়তাম না। বলছিল, আমার বাবা খারাপ ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে বারণ করেছেন।

হল্লী বলল, অজিত কাকার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি।

রাধে বলল, তুমি মূর্খ, তাই এমন কথা বলছ!

ঋণের প্রসঙ্গ ওঠায় হল্লী লজ্জিত হয়ে উঠেছিল। হীরালাল সম্বন্ধে অধিক আলোচনা বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই সে এইকথা বলেছিল। কিন্তু এই কথা বলেই সে বুঝতে পেরেছিল যে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। কাজেই সে চুপ করে রইল।

রাধে আবার বলল, কেউ যদি কিছু বলে, আমার কাছে জিজ্ঞেস কোর। তোমার বাবা মারা গেছেন।

হল্লী বলল, মরে কেন যাবেন? যাও নিজের বাড়ী, এই রকম কথা আমি শুনতে চাই না।

রাধে হেসে ফেলল। বললে, সকলেরই বাবা মরেন, এতে বিরক্ত হবার কি আছে? দেখ, আমার একটা কথা শোন। অজিতকে নিজের ঘরের দেহলীতে যেতে দিও না। সে বদ লোক।

বদ কেন?

সে তোমার মাকে জাদু করেছে। এ কাজ আর কেউ করতে পারেনি।

হল্লী বলল, আমার মাকে কেউ জাদু করতে পারে না। আমাদের বাড়ীতে ভূতও আসতে পারে না। তিনি খুব ভালো ভাবেই থাকেন। কখনো কোন অন্যায় কাজ করেন না।

হল্লীর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে রাধে বলল, যদি রাগ না কর তাহলে বলি।

বলো।

তোমার মা অন্যায় কাজ করতে যাচ্ছেন, খুব অন্যায়, এই অজিতের—

রাধে তার বক্তব্য শেষ না করতেই, হল্লী তাকে ধাক্কা মেরে দরজার বাইরে ঠেলে দিল। সে চেঁচিয়ে উঠল, দেখ কাকী, হল্লী আমাকে মারছে।

ধমক দিয়ে ভিতর থেকে যমুনা বলল, কি উৎপাত করছিস হল্লী? দাঁড়া, দেখছি।

রাধে পালিয়ে গেল। তার ভয় হল পাছে হল্লী তার সামনেই সে কি বলছিল তা মাকে বলে দেয়।

হল্লী শান্ত ভাবে বসে চিন্তা করতে লাগল, সত্যিই কি বাবা মারা গেছেন, পাছে আমি কান্নাকাটি করি এই জন্যই মা খবরটা চেপে যাচ্ছেন, তবুও লুকিয়ে লুকিয়ে তিনি তো কাঁদতেন। আমি ফিরে এসে মাকে প্রসন্নই দেখেছিলাম।

তিনি মারা যাননি! হল্লীর মুখ থেকে এমন ভাবে এই কথা বার হল যেন সে কারও সঙ্গে বাদানুবাদে উত্তর দিচ্ছে। সে ভাবল—যদি বাবা মারা যেতেন তাহলে আমার মন আন-চান করত আর মাও উদাস হয়ে পড়তেন। একদিনের কথা তার মনে পড়ে গেল—খেলা করতে করতে একবার সে খুব আঘাত পেয়েছিল। ঠিক সেই সময় তার মায়ের মনও কেমন-কেমন করে উঠেছিল। তার মা নিজেই তাকে এই কথা বলেছিলেন। দীপার মাও বলছিলেন যে তাঁরও এই রকম হয়। সে আরও ভাবল—মা লুকিয়ে হয়তো কাঁদেন। কিন্তু তাঁর হাতে চুড়ী তো এখনও আছে। এ রকম হলে হাতের চুড়ী ভেঙে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর নাই;

আর যদি না ভেঙে ফেলা হয়, তাহলে চুড়ীগুলো নিজেই ভেঙে গিয়ে বুকে বিঁধে যায়! না, আর আমি রাধের কথায় কান দেব না।

উঠে সে বাইরে বেড়াতে চলে গেল। বাইরের বাতাস লাগতেই তার মনের উদাসভাব কেটে গেল। ও ভাবল হীরার কাছে গিয়ে নিজেই সব জিজ্ঞেস করবে, তাহলে সে ঠিক সব কথা বলে দেবে।

মাঠে প্রাণ ভরে খেলা শেষ করে সন্ধ্যার ঝাপসা অন্ধকারে সে রাধের সঙ্গে ফিরে আসছিল। গলির মধ্যে পথে এক জায়গায় দেখতে পেল বেশ শক্ত করে মুড়ে বাঁধা একটা কাগজের ঠোঙা পড়ে আছে। সে বলল—কোন পথিকের হাত থেকে চীনা বাদামের ঠোঙা পড়ে গেছে। বাজার থেকে কিনে হয়তো বাড়ী ফিরছিল।

রাধে বলল, না তামাকের ঠোঙা হতে পারে। এ রকম তামাকের ঠোঙা হয়।

হল্লী এগিয়ে গিয়ে চট করে সেটা তুলে নিল। ঠোঙাটি বেশ ভারী ছিল। বলল, কি জানি কার!

দে, খুলে দেখি—বলে রাধে হাত বাড়াল।

হল্লী ওটা খুলে দেখবার জন্য নাড়ানাড়ি করছিল, কিন্তু পাছে খুলে ফেলার কৃতিত্ব রাধের হয় সেই জন্য নিজেই খুলতে শুরু করল। রাধে হল্লীর গা সেঁটে উৎসুক হয়ে দেখছিল ঠোঙায় কি আছে।

কেউ মজা করেছে—বলে হল্লী ঠোঙাটি দূরে ছুড়ে ফেলে দিল। ঐ মোড়কে কাঁকরের ধুলো-বালি ছিল। বাতাসে উড়ে সেগুলি এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ঐ মোড়ক খুলছিল বলে হল্লী লজ্জিত হল। কিন্তু রাধে জোরে হেসে উঠল, ভাবল—ভালই হয়েছে সে ঠোঙায় হাত দেয়নি।

অন্যদিক থেকে আরও দু-তিনটি ছেলে দৌড়ে ওখানে এসে জড়ো হল। তাদের মধ্যে হীরাও ছিল। সে বলল, আমার চীনা বাদামের ঠোঙা এখানে পড়ে গেছে। বল, কে শেষ করে ফেলেছ? আমি দাম আদায় করব।

অন্য ছেলেরা খুব হাসতে লাগল। একটি ছেলে বলল, চীনা বাদাম নয়, তামাক ছিল। হল্লী তামাক টানে। আমি পণ্ডিতমশায়কে বলে দেব। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে হল্লী স্থির করছিল যে হীরার সঙ্গে দেখা করে সে

চিঠির বিষয় সব জেনে নেবে, কিন্তু এই সময় সে রেগে উঠল। সে হীরাকে বলল, তুমি অতি ওঁছা।

তুমি ওঁছা কি আমি? অন্যের জিনিস কুড়িয়ে নাও—এটা চৌর্য, আমি তোমায় থানায় বন্ধ করাব।

আমায় থানায় বন্ধ করবে এমন কেউ নাই।—বলে হল্লা এগিয়ে চলল। হীরাও তার পেছনে পেছনে চলল। সে বলল, কেন তুমি আমার পেছনে পেছনে আসছ?

আমার ইচ্ছে। তুমি কাউকে পথে হাঁটতে বারণ করতে পার না।

বেশ যাও—বলে হল্লী দাঁড়িয়ে রইল।

আমি যাব না। তুমি যেতে বলবার কে? আবার যেই হল্লা চলতে লাগল অমনি সঙ্গে সঙ্গে হীরাও চলল, যেতে যেতে বলল, বাড়ী চল, সেখানে যমুনা কাকীকে দিয়ে তোমাকে পিটুনি দেওয়াব।

হল্লী ঘুরে দাঁড়াল, বলল, রাধে চল, আমরা মোহন্তের বাগানবাড়ীতে গিয়ে চান করে আসি। রাত্রিতে ভূতেরা থাকে, তাদের দাঁত দেড় হাত লম্বা। দেখি আমার সঙ্গে কে কে যায়। দেখ ঐদিকে অন্ধকারে হাঁ করে একটা ভূত দাঁড়িয়ে আছে।

হল্লীর বিকট ভূত—ভঙ্গী দেখে অন্য ছেলেরা, বাপরে খেয়ে ফেলবে—বলে পালাল।

হীরা বলল, আমি ওঁছা ছেলেদের সঙ্গে যাই না।

[২৬]

যমুনা বলল, হল্লী, তোর কাকাকে একটু ডেকে আন। হল্লী বুঝতে পেরেছিল যে অজিত কাকাকেই ডেকে আনতে বলছেন। তবু জিজ্ঞেস করল, মোহন কাকাকে?

তাঁকে নয়রে, তোর কাকাকে।

তুমি অজিত কাকার কথা বলছ। এখন আমাকে অঙ্ক কষতে হবে—এটা না করে কাল স্কুলে গেলে পণ্ডিতমশায় মারবেন। একটু পরে যাব।

এক ঘণ্টা ধরে তো নানা রকম উৎপাত করছিস। যা এখনি। যাবি কি না?

হল্লী মায়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখল। জল দিয়ে ছিটিয়ে নিবানো আগুনের মধ্যে যেন ক্রোধের একটি স্ফুলিঙ্গ সেখানে ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল। ঝিলিক দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে নিবে গেল। মায়ের ব্যাকুল ভাব দেখে হল্লী চিন্তিত হয়ে উঠল। হঠাৎ সে কিছুটা অসঙ্গত প্রশ্ন করল, তুমি তো বলছিলে বাবার চিঠি আসেনি?

অন্য সময় হলে এই অবিশ্বাসের কথার জন্য যমুনা তাকে ধমকে দিত। কিন্তু এ সময় সে তা করতে পারল না। সে বলল, আমার কাছে আসেনি রে! এলে কি তোকে দেখাতাম না? শুনতে পেয়েছি অন্য কোথাও এসেছে।

হীরার কাছে এসেছে? মিথ্যে কথা—তৎক্ষণাৎ হল্লী বলল। হীরার কাছে চিঠি আসার কথা যখন তার নিজের মনে জাগে তখন সেটা সে স্বীকার করে নেয়, কিন্তু অন্য কেউ সে-কথা বললে তার প্রতিবাদ করতে চায়।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর হল্লী আবার বলল, হীরার কাছে চিঠি কি জন্যে আসবে? এলে আমার কাছেই আসত। হ্যাঁ, যদি এসেই থাকে তবে হয়তো অজিত কাকার কাছেই এসেছে। আমি তাঁকে এ-বিষয় জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, এ-সব কথায় তোমার কি প্রয়োজন, তুমি খাও-দাও, খেলা কর, আর লেখা-পড়া কর। যদি কিছু করবার থাকে আমি সব করব। মনে হচ্ছে জেনে-শুনেই তিনি বিষয়টা আমার কাছে গোপন রাখছেন।

হীরালালের সঙ্গে স্কুলে তোর দেখা তো হয়?

কয়েক দিন হল সে স্কুলে যায়না। পণ্ডিতমশায় তাকে ঠেঙিয়েছিলেন। মার খাবে না তো কি! নিজেও পড়বেনা, অন্যকেও পড়তে দেবেনা! কেবল কথাই বলে।

যমুনা বলল, সে আমার কাছে এলে তাকে জিজ্ঞেস করব।

সে নিজের বাপকেই মানেনা, তোমাকে মানবে! সে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে নিজের সঙ্গীদের বলে—তার কাছে চিঠি এসেছে আর সে

জবাবও লিখে পাঠিয়েছে। আমি মনে করি অজিত কাকার কাছে চিঠি এসেছে শুনে সে এই কথা বানিয়ে বলেছে। রাধেও বলে যে অজিত কাকার কাছে চিঠি এসেছে।

যমুনা বলল, না, তাঁর কাছে চিঠি আসেনি, যা তুই তাঁকে ডেকে নিয়ে আয়।

অজিতের প্রতি মায়ের এই আস্থা হল্লীর ভাল লাগল না। বলল, তাঁর প্রতি তোমার আস্থা খুব বেশি, এটা ভাল না। রাধে বলে— আমার বাবা তাঁকে কোন একটা বিষয় নোটীশ দিয়েছেন। তাই অজিত কাকা সে-কথা চেপে গেছেন। এক দিন সত্য খবর আপনিই প্রকাশ হয়ে পড়বে।

যমুনা কঠোর হয়ে বলল, তুই জানিস না। আমি বলছি, যা!

হল্লী চলে গেল।

যমুনা শুনেছিল যে তার স্বামীর পীড়ার খবর কোথাও হতে এসেছে। পীড়ার সংবাদে কিছুক্ষণের জন্য তার মনে আনন্দের বিদ্যুৎ-প্রবাহ হয়েছিল। হোক না কেন অসুখ, তবু তো তিনি বেঁচে আছেন—এই ভেবে আবার পর মুহূর্তেই বিচলিত হয়ে উঠল—কি জানি কোথায় কেমন অবস্থায় আছেন, কত রকমের কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁকে ওষুধ দেবার জন্য, পথ্যাদি দেবার জন্য, গায়ে বাতাস দেবার জন্য, সেখানে কেউ আছে কিংবা নাই! এ-সব বিষয় কেমন করে খোঁজ পাওয়া যায়? তার কাছেও তো সোজাসুজি চিঠি আসতে পারত। কতদিন তো হয়ে গেল। কতদিন ধরে সে একটা কিছু শোনবার জন্য চোখ-কান খুলে পথ চেয়ে বসে আছে, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, বৎসর—একে একে না জানি কতবার এসে এসে চলে গেছে। সব কিছুর পরেও ঘুমে জাগরণে দুঃখে সুখে যমুনা তার একটি আশা ছাড়েনি। একটি আশা তার মনের মধ্যে জেগেই আছে। এটা ঠিক যে উপরে ভস্মের একটি স্তর দেখা যাচ্ছিল। এ-রকম অবস্থায় বিভ্রম ঘটা অসম্ভব নয়, কিন্তু আজ সেই ভস্মে সহসা হাত ঠেকায় বুঝতে পারল এই ভস্মেও কম তাপ ছিল না। এর মধ্যে প্রধান বিষয়টি আরও সুরক্ষিত হয়ে ধক্-ধক্ করছে।

তার স্বামীর সম্বন্ধে ঠিক খবর এসেছে, খুব কাছেই এসেছে, এত কাছে

যে চোখে দেখতে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সংবাদ তো চোখ দিয়ে দেখা যায় না। সেটা কানের বিষয়। কেন তার কান শুনতে পাবেনা? সে তো প্রাণ থাকতেও এমন কিছু হতে দেয়নি, যার জন্য তাকে এত বড় শাস্তি সহ্য করতে হবে। যদি কিছু এমন তার দ্বারা হয়েও গিয়ে থাকে সে জন্য তার হৃদয় কাতর হয়ে বলছে—হে আমার ভগবান, সে-সব কি আমি অন্তর থেকে করেছিলাম? তুমি কি জাননা, সে-দিন আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে নিজেকে কোথায় হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার মুখ থেকে কে যেন কি বলিয়ে নিয়েছিল। হে ভগবান, তুমি আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর।

এ কেমন হল? তার বিশ্বাস ছিল যে যখন তার গ্রহ ভালো হবে তার স্বামী তার কাছে এসে উপস্থিত হবে। সোজা তার কাছে এসে বিস্মিত করে দেবে, ঘুম থেকে জাগিয়ে। বলবে—ভালো আছ তো! এই রকমই ঘটবে অন্য রকম হতেই পারে না। হায় আজ, এ কী হল? আমার চেয়ে তাঁর নিজের বলতে এই গ্রামে আর কে আছে, আমি কি এতই অবিশ্বাসিনী যে, তিনি মনে করেন তাঁর সুখ-দুঃখের সাথী আমার চেয়ে বেশি অন্য কেউ? হে আমার ভগবান, এ কী হল? আমার দোষের জন্য অন্য কাউকে দুঃখ দিওনা। কে জানে এ সময় তাঁর ভাগ্যে কি ঘটছে! শুনলে, আমার কথা!

থেকে থেকে তার চোখ ফেটে অশ্রু ঝরতে লাগল।

কতক্ষণ যে কেটে গেছে সে তা টের পায়নি। হল্লী এসে পড়ায় সে চম্‌কে উঠল। হল্লী এসে বলল, কোন একটা কাজে অজিত কাকা ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন, বললেন—পরে যাব, এখন একটা খুব জরুরী কাজ আছে।

যমুনা অজিতকে ডেকে পাঠিয়েছিল এই কথা জানবার জন্য যে অসুখের এই সংবাদ কি করে রাষ্ট্র হচ্ছে, মতিলাল চৌধুরীর কাছে কি সংবাদ এসেছে? হতে পারে জগরামের কাছে এসেছে। যেমন করেই হোক খবর অজিত সংগ্রহ করুক। যমুনার হাত-পা যেন অবশ হয়ে গেছে। সে ঠিক করে উঠতে পারছে না যে সে কি করবে।

অজিত ডাক ঘরের দিকে যাচ্ছিল, পথেই একটি পিওনের সঙ্গে দেখা হল। তাকে ডেকে বলল, শোন, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

পিওন তার এত কাছে এসে দাঁড়াল যেন কানে কানে ফিস-ফিস করে কিছু শুনবার জন্য প্রস্তুত! অজিত চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করল, সম্প্রতি যমুনার নামে কোনো চিঠি এসেছিল?

এসে থাকবে। কেন?

কেন আবার কি! তুমি সে চিঠি ভুল করে অন্য কাউকে দিয়েছ।

কিন্তু মাতে, অন্যের চিঠির বিষয় তোমাকে কেমন করে বলি? আমাদের রুল এ নয়, পোষ্টাল গাইডে লেখা আছে।

যাই লেখা থাক, তুমি কিন্তু একজনের চিঠি আর একজনকে দিতে পার না। যমুনা টের পেয়েছেন। তিনি এ বিষয় অভিযোগ করতে কালেক্টর সাহেবের বাঙলোয় যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আমি তাঁকে বাধা দিলাম। বললাম, পিওনরা আমাদের সকলের সঙ্গে নিজের লোকের মতনই মেলা-মেশা করে। কারও অন্ন মারা যায় এমন কাজ করা অনুচিত। যদি ভুল করে কাউকে চিঠি দিয়ে থাক, তাহলে সেটা ফেরৎ এনে আমাকে দাও, কেউ যেন অভিযোগ করবার সুযোগ না পায়, আমি এই-ই চাই। আমি যমুনাকে নিরস্ত করে এসেছি।

পিওন বলল, তিনি যদি অভিযোগ করতে চান কালেক্টরসাহেবের কাছে কেন, লাটসাহেবের কাছে যান। এ জন্য আমি ভয় করি না। কিন্তু তাঁর চিঠির কথা আমি তোমাকে কেমন করে বলতে পারি? এটা নিয়মবিরুদ্ধ।

আর এটাও তো নিয়মবিরুদ্ধ যে তুমি তাঁর নামের চিঠি মতিলাল চৌধুরীর ছেলেকে দেবে।

পিওন হেসে বলল, যমুনার চিঠির কথা এখন তোমাকে বলব না। এখনও তুমি আত্মীয়-স্বজনদের ভোজ খাওয়াওনি, আমাকে মিষ্টি খাওয়াওনি। আর কোন আনুষ্ঠানিক-লৌকিক ক্রিয়া-কাজ হয়নি। কাজেই তুমিই বল এখন আমার কি কর্তব্য। যে-দিন এই-সব হয়ে যাবে, সে-দিনই তো তুমি কর্তা হবে।

অজিত বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি এ-সব বিশ্রী কথা বলছ। বেশ দেখা যাবে।

অজিত এই বলে নিজের পথে এগিয়ে চলল।

পিওন অজিতকে ডেকে বলল, দেখ মাতে, অসন্তুষ্ট হয়োনা। আসল কথা বলছি। আজ কয়েক মাস ধরে আমার ডিউটি অন্য গ্রামাঞ্চলে। এই গ্রামের কাজ রাম সিং করে। কিন্তু আমি জানি যে যমুনার একটা চিঠি এসেছিল। চিঠি সর্ট করবার সময় আমি তার নাম শুনতে পেয়েছিলাম। পনের দিন হয়ে গেল। বাস্, এইটুকুই—

বেশ। এইটুকু তো পুরাতন কথা—অজিত বলল। সে এটা প্রকাশ করলনা যে সে এ-বিষয় নিজে কিছু জানে না।

পরে পিওন বলল, সেই চিঠি রাম সিং মতিলাল চৌধুরীর ছেলের হাতে দিয়েছিল—সেই ছেলেকে, যে যমুনার ছেলের সঙ্গে স্কুলে পড়ে। রাম সিং-এর সম্বন্ধে এ-রকম অনেক অভিযোগ আছে। তুমি নিশ্চয়ই ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়ে দাও। কিন্তু কালেক্টরের কাছে অভিযোগ করলে কিছু হবে না। তুমি যদি চাও আমি তোমাকে বলে দেব, কোথায় কাকে লেখা উচিত। রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা কোর। এখন তো কাজে যাচ্ছি। চৌদ্দ-পনের মাইল চক্কর দিয়ে কয়েকটি গ্রাম ঘুরে রাত্রিতেই ফিরে আসব। এতই পরিশ্রম করতে হয়।

সে চলে গেল।

অজিত মতিলাল চৌধুরীর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হল। চৌধুরী তাঁর নতুন বৈঠকখানায় ছিলেন। সে ঘরে এখন চুন-কাম হয়নি, পলেস্তরা হয়নি; এমন কি দেয়ালের সামনের দিকে যে দুটো আলমারী ছিল, তার চৌকাঠে দরজাও লাগানো হয়নি। কিন্তু ঘরটি নতুন ধরনের তৈরী। এই-জন্যই তিনি এখন থেকেই ঐ ঘরেই বসেন। একটি পুরাতন সতরঞ্চি উপরে, তার জায়গায়-জায়গায় কালির দাগ। গদী আর তাকিয়ার কাছে বইখাতার থলিয়া খুলে, তিনি কিছু কাগজপত্র উল্টে-পাল্টে দেখছিলেন। অজিতকে দেখে সেগুলি থলিয়ার কাপড়ে ঢাকা দিতে দিতে বললেন, মাতে, এসো, আজ ভুলে কি এদিকে এসে পড়লে?

অজিত নমস্কার করে বলল, এম্নিই এসেছি।

কিছুক্ষণ পরে অজিত জিজ্ঞেস করল, হীরা কোথায় চৌধুরী?

চৌধুরীর চেহারায় অপ্রসন্নতা ফুটে উঠল। তিনি বললেন, এখনি সে বাইরে গেছে। কেন, তার কাছে কি কাজ? আমাকে জিজ্ঞেস কর যা জিজ্ঞেস করবার।

এমনিই—চৌধুরী, তুমি হীরাকে শহরে পড়তে পাঠিয়ে দাও। একটু ইংরাজী শিখতে পারলেই তহশীলদার হবেই। হাকিমরা লেখা-পড়ার দিকে তেমন লক্ষ্য রাখেন না। মানুষ বড় বংশের হলেই হল—অমনি তার জন্য ব্যবস্থা হয়ে যায়, দেরী হয় না। পড়াবার জন্য ভগবানের দয়ায় তো বাড়ীতে টাকার অভাব নাই। এমন লোকই যদি না পড়াবে, তো কে আর পড়াবে। বনেদী বংশের লোকেরা পড়া-শোনা করে না বলেই বড় বড় পদের জন্য সরকারকে বিলেত থেকে শিক্ষিত নতুন নতুন সাহেব আমদানি করতে হয়। আমি বলছি, হীরাকে অবশ্যই পড়াও। চৌধুরী বংশের কারও হাকিম হওয়া উচিত।

চৌধুরীর অপ্রসন্নতা দূর হল। তিনি বললেন, পড়াবার ইচ্ছে তো আমারও আছে, কিন্তু ভয় হয়, শহরে গিয়ে বদ-সঙ্গে না পড়ে যায়।

তা হবে না। মাসে পনের দিন তোমাকে তো কাছারীর কাজে শহরে যেতেই হয়। ভাল করে দেখা-শোনা যদি কর তাহলে মন্দ কিছু হবে না।

চৌধুরী অন্য প্রসঙ্গ পাড়লেন।—যমুনার সঙ্গে তুমি ঘর করবে শুনেছিলাম। সে-কাজে বিলম্ব কেন হচ্ছে? শোন মাতে, আমার কথা। এই রকম ব্যাপারে বিলম্ব করলে পরে হাত কচলাতে হয়। কেউ যদি এর মধ্যে একটা ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করে—তাহলে কি ঝগড়া বাধাতে পারে না? যমুনাও অন্য কারও কথার দ্বারা চালিত হতে পারে। কাল কি হবে কেউ বলতে পারে না। যা কাল করবে আজই তা করা উচিত। আর তুমি আমার ঝগড়াও মিটিয়ে দাও। এই ব্যাপারটা চুকে গেলে তোমার খাওয়া-পরার মতন যথেষ্ট থাকবে আর আমারও লোকসান হবে না। আদালতে গেলে উভয় পক্ষেরই দুর্ভোগ, আদালত তো নামে মাত্র আদালত, আসলে সেটা ষোল আনা দোকানদারী। এখানে দুই টাকা ভেট দাও, ওখানে চার টাকা ভেট দাও। এই-ই তো হয় সেখানে।

অজিত বলল, কাগজপত্রে হিসাব তো দাও। বল কবে কত দেওয়া

হয়েছে আর কবে কত পাওয়া গেছে। সুদের হার কি, কত সুদ হয়েছে সব ভালো করে তো জানা দরকার। যমুনাকে নিয়ে আমার সম্বন্ধে যা শুনেছ, তা নিছক গল্প। যমুনা এমন নয় যে—

বাঃ, আমার কাছেও উড়ছ! কথা আগুনের মতন। তা গোপন করবার চেষ্টা করলেও গোপন রাখা যায় না। তোমার প্রশংসা করছি। কোন পাখী যেখানে ঘেঁসতে পারেনি তুমি সেখানে বাসা বেঁধেছ। 'যেখানে না যায় রবি সেখানে পৌছয় কবি'। ব্যাপার এমনি হল। খুব উত্তম। এতে নিন্দার কিছু নাই। কেমন আঁচ করেছি বল!

অজিত বলল, বৃথা বলছ চৌধুরী, আমি বলছি এ-সব কিছুই নয়।

এ-কথা ঠিক না হয় তো না হোক, তবু এই সুযোগে কিছু করে নাও। এ-বিষয়ে যা সহায়তা দরকার আমি দিতে রাজী আছি। আর দেরী কোর না। তবে হঁ্যা, আমার ঝগড়া মিটিয়ে দিতে হবে তোমাকে। বাস্, দেরী কোর না।

অজিত বলল, তাড়াতাড়ি এজন্য করব যেহেতু বৃন্দাবন বেঁচে আছে এই খবর তুমি পেয়ে গেছ। তাড়াতাড়ি যমুনার জমি আর কুয়ো তোমার কবলে দিয়ে দেব যাতে পরে বৃন্দাবন ফিরে এলে আর কিছু করবার উপায় না থাকে। তাই না?

অজিতের কথা শুনে মতিলাল কিছুক্ষণ হতবাক্ হয়ে থাকার পর শুষ্ক হাসি হেসে বলল, সকলেই বেইমান হয়না যাতে! আমি তো এই ভেবে বলেছিলাম যে তোমারও লাভ হোক আমারও ঝঞ্ঝাট চুকে যাক।

এমন সময় ঘরের ভিতর থেকে হীরা এসে বলল, বাবা, সেই জিনিষ সিন্দুকে নাই। দিদিমা ভাল করে দেখেছেন।

মতিলালের ভাল লাগল না এই সময় হীরালালের উপস্থিতি। কিছুক্ষণ আগেই সে অজিতকে বলেছিল যে হীরা বাড়ীতে নাই, বাইরে গেছে। তাই সে হীরাকে বলল, বেশ, এখন যা।

অজিত হেসে বললে, হীরা একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি।

অজিতকে দেখলে হীরালালের রাগ হত তবু এ-সময় খুশী হল এই ভেবে যে, যে মাতে হয়ে ঘুরে বেড়ায় আজ তাকে দেনাদারের মতন তার

[হীরার] বাড়ীতে এসে বসতে হল। সে কিছু বলবার আগেই মতিলাল বলল, ছেলের কাছে কি জিজ্ঞেস করছ, আমাকে জিজ্ঞেস কর যা জিজ্ঞেস করতে হয়।

হীরা বলল, বাধা কেন দিচ্ছ বাবা? আমার কাছে জিজ্ঞেস করতে দাও। জবাব দিয়ে ওর মুখ ভোঁতা করে দেব। সেই চিঠির বিষয় জিজ্ঞেস করতে চাইছ, কর জিজ্ঞেস, কি জিজ্ঞেস করবে?

অজিতের মুখ লাল হয়ে উঠল। এই ছেলেটি এত ধৃষ্ট হতে পারে সে এটা কল্পনাও করতে পারেনি। বললে, সুপুত্র তুমি, এমনি করেই কুলের নাম উজ্জ্বল করবে। হ্যাঁ, চিঠির কথাই জিজ্ঞেস্ করতে এসেছি। যমুনার একটা চিঠি তুমি পিওনের কাছ থেকে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছ?

আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি—আমাকে এ-কথা জিজ্ঞেস করবার তুমি কে? তুমি কি দারোগা না হাকিম যে তোমার প্রশ্নের জবাব দেব? ফিরে যাও নিজের বাড়ী, তোমাকে বলব না।

এই কথা বলে হীরালাল সেখান থেকে চলে গেল।

কিছু খারাপ লাগলেও মতিলাল খুশী হল। সে এমন করে অজিতকে কড়া জবাব দিতে পারত না। সে এই ভেবে সন্তুষ্ট হল যে লেখা-পড়া শিখে হীরা তহশীলদার যদি নাও হতে পারে তাতেই বা কি। লেন-দেন ব্যাপার, আর জমি-জমা দেখা-শোনা আমার চেয়ে ভালই করবে।

অজিত উঠে দাঁড়াল। বলল, ছেলে মানুষ, তাই ছেড়ে দিলাম, অন্য কেউ হলে এখনি দেখে নিতাম। বেশ কথা, আমি এখনি থানায় গিয়ে রিপোর্ট করছি।

মতিলাল তাকে হাত ধরে বসাল। বলল, এই ছেলেটা এমনিই তো কাউকে মানে না। আচ্ছা, চিঠির ব্যাপারটা কি?

চিঠির কথা তুমি জান না চৌধুরী? প্রত্যেক বিষয়ে চালবাজী ভাল না। কোথাও যদি চিঠিটা হারিয়েই ফেলে থাকে তো যাক, কিন্তু চিঠিতে কি লেখা ছিল সেটা তো জানা দরকার?

চৌধুরী বলল, পিওন বলেছে সে যমুনার কোন একটা চিঠি হীরা-লালকে দিয়েছিল? সে একজনের চিঠি আর একজনকে কেন দেবে? তবু আমি হীরাকে নিরিবিলিতে ডেকে সব কথা জিজ্ঞেস করে তোমাকে

বলব। এখন সে কিছুই বলবে না! তুমি তো তার কথা শুনলেই। শান্তভাবে তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

তুমি কি জিজ্ঞেস করবে তা বুঝে নিয়েছি। আচ্ছা দেখব—বলে অজিত বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে তখনি চলে গেল।

[২৮]

যমুনা কোথায় যাবে কি করবে, সে বুঝতে পারছে না। তার সামনে চারিদিক শূন্যতায় ভরা। পতি জীবিত এ-বিশ্বাস আগেও তার ছিল। কিন্তু তখন তা ছিল অপ্রত্যক্ষ, অপ্রমাণিত, অপ্রত্যক্ষ অপ্রমাণিত ঈশ্বরের মতন। এমন ঈশ্বরকে সর্বত্র যে-কেউ পেতে পারে, কোন সময়েই সে দূরে যায় না। আজ তা প্রমাণিত প্রত্যক্ষ। তা পাবার জন্য সে কি করবে, কোথায় যাবে? আজ তা সর্বত্র নাই। তার একটা নিশ্চিত স্থান আছে, আর এখন কোন প্রতীক দিয়ে কাজ হবে না। এখন তাকে একটি নিশ্চিত কেন্দ্রে উপলব্ধি করতে হবে।

বন্দীশালায় বন্দী ছটফট করে বাইরে বেরোবার জন্য। যমুনাও প্রথম অবস্থায় কম ব্যাকুল ছিল না। এখন সে ঐ অবস্থার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, এখন আরও বেশি ব্যাকুল। এত বড় স্বাতন্ত্র্য, এত বড় বিস্তারের মধ্যেও সে কোন আশ্রয় দেখতে পাচ্ছেনা।

উঠান দিয়ে সে কোথাও যাচ্ছিল, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। নিজের মধ্যে কিছুক্ষণ নিজে মগ্ন থাকার পর আবার হাঁটতে লাগল। হাঁটছে কিম্বা দাঁড়িয়ে আছে এই বোধ তার নাই। তার চলা আর না চলা দুই-ই সমান। তার চলা না চলার মতন এবং না চলাটাও চলার মতন।

কোথেকে হল্লী এসে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরল। মায়ের মুখের দিকে মুখ তুলে বলল, মা, তোমার দুঃখ কিসের? বল আমাকে ,মা, তুমি কেন এত দুঃখিত?

যমুনা তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। এর আগে হল্লীর সামনে সে কাঁদেনি। কাঁদেনি বটে, কিন্তু না কেঁদে যে অবস্থায় ছিল তা কাঁদবার চেয়ে বেশি খারাপ ছিল। এই রকম ভাবে কেঁদে ফেলাই তার চেয়ে ভাল।

হল্লীও কেঁদে ফেলল। বলল, মা, তুমি কেঁদনা, কেঁদনা!

না কেঁদে কেমন করে থাকব বাছা! প্রাণ কেমন করছে ভাল করে কাঁদতে দে, বারণ করিস না।

কাঁদতে কাঁদতে হল্লী নিজেই মায়ের চোখের জল মুছে দিতে লাগল। পরিস্থিতি এমন হল যে ছেলেই মায়ের অশ্রু মুছে দিচ্ছে—অশ্রু মুছে দিলেও তা আরও বেশি করে পড়ছে।

সহসা হল্লী শান্ত হল। সে বলল, মা, তুমি কেঁদনা। তুমিই তো বল যে ভগবান যা করেন তার ফল মন্দ হয় না।

শুধু এই-ই নয়, হল্লীকে যমুনা আরও কত রকমের উপদেশের কথা বলে। কিন্তু আজ কেমন একটা অস্বস্তি তার মনে এসে পড়েছে বলে ঐসব হিতবাক্যগুলি যেন ধামাচাপা পড়ে হতচৈতন্য হয়ে গেছে। যমুনা তার নিজের কথায় আজ আর নিজেই সান্ত্বনা পায় না।

হল্লী বলল, আমি এ বেলা স্কুলে যাবনা! তোমার কাছেই থাকব, আমার শরীর আজ ভালো নাই। সন্ধ্যে বেলায় আমার জন্য গরম গরম রুটি কোর। তোমার শরীরও ভালো নাই। আমার এবেলা ক্ষিধে পাবে না।

এর আগে যমুনা টের পায়নি যে হল্লীর গা গরম। এখন তা টের পেল। ভীত হয়ে সে বলল, ওরে, তোর তো জ্বর হয়েছে।

জ্বর হয়নি। তোমার দুঃখ দেখে মন যেন কেমন হয়ে গেছে, তাই এই রকম ঠেকছে।

বর্ষার কোনো অন্ধকার রাত্রের গুমট গরমের মতন এই নতুন দুর্ভাবনা এসে যমুনাকে বিকল করে তুলল। সে বলল, জ্বরই তো। এখন তুই এদিকে-ওদিকে ঘুরে গায়ে বাতাস লাগাস না। বিছানা পেতে দিচ্ছি, চল, ভাল করে শুয়ে থাক।

তুমি কাঁদছ বলেই তো জ্বর বাড়ছে।

হল্লী বিছানায় শুয়ে পাশে মাকে বসাল। সাধারণত স্বাভাবিক অবস্থায় সে কখনো এমনভাবে শোয়না, কিন্তু আজ এই সময় সে শুয়েই পড়ল।

দু-তিন ঘন্টা পরে যমুনা একা উঠানে এসে বসল। কিছু করতে তার ইচ্ছে করছে না। হল্লীর জ্বর ছিল না, সে বাইরে গেছে।

রূপা এল, যমুনার দুঃখের দিনে সে ছিল তার সঙ্গে, তাই রূপার আসাটা তার খারাপ লাগেনি।

রূপা বলল, তুমি এই রকম ভাবে একা বসে থাক, এটা ভাল না। চার-পাঁচ জনের সঙ্গে বসলে দুঃখ ভাগা-ভাগি হয়ে যায়।

কিছু আজে-বাজে কথা বলার পর বলল, হোরীপুরার মাতে অজিত যে এমন তা জানতাম না।

যমুনা মাথা নেড়ে সায় দিল। কেমন যেন অন্যমনস্ক ছিল সে।

সব জায়গায় নিন্দে হচ্ছে। কেউ জানত না যে তিনি এমন কাজ করতে পারেন।

যমুনা বলল, বোনটি, কেউ কারও মনে কি আছে জানে না। নিজের ভাগ্য যখন ভাঙে তখনি এমনি হয়।

রূপা বললে, কারও ভাগ্য কি ভাঙে! কারও উচিত নয় কারও নিন্দা এমন ভাবে করা। যখন হল্লী পালিয়েছিল তাকে খুঁজে বার করবার জন্য উনি যে-রকম ভাবে রাত্রি—দিন পরিশ্রম করেছিলেন, তা দেখে আমি ভাবতাম এই যুগেও এই রকম পুরুষ হয়! সবাই ধন্য ধন্য করছিল। আমি কি জানতাম যে এই রকম অন্তরঙ্গ ভাবে মিশে কারও মূলোচ্ছেদ করা যায়?

যমুনা নিজের অন্যমনস্কতা সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, হোরীপুরার মাতের কথা বলছ কি?

তবে এতক্ষণ কি শুনছিলে?

আমি ভেবেছিলাম অন্য কারও বিষয় বলছ। হয়তো হীরালালের বাবা চৌধুরীর বিষয়।

যমুনার প্রতি রূপার খুব দয়া হল। সে ভাবে অতি-দুঃখে যমুনা পাগল না হয়ে যায়।

যমুনা জিজ্ঞেস করলে, মাতের বিষয় কি শুনেছ?

সঙ্কোচের সঙ্গে রূপা বলল, বিশ্রী সব কথা। কোন রকমে তোমার বাড়ীতে জোর করে এসে তোমার জমি-জায়গার মালিক হবার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। বিদেশ হতে তাঁর চিঠি এসেছিল, সে-চিঠি তোমাকে না দিয়ে, জবাবে তাঁকে লিখে দিল যে হল্লী—থাক, সে বলবার কথা নয়। জবাবে এমন সব কথা লিখে পাঠাল যাতে তিনি যেন না আসেন এখানে।

যমুনা চুপ করে বসে রইল। বুঝতে পারা যাচ্ছে না তার মনে কি হচ্ছে। রূপা আবার বলল, তোমার সম্বন্ধেও অনেক কিছু রাষ্ট্র হচ্ছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়না।

আমার সম্বন্ধে যা শুনেছ, তা সত্য—বলতে বলতে যমুনার চোখে জল এল।

রূপা বলল, তুমি এ কেমন কথা বলছ, আমি কি জানিনা তুমি কেমন।

তুমি জাননা। আমি তো আজ বেঁচে তোমার সামনে এসে দাঁড়াতেই পারতাম না। যাঁর নিন্দা রাষ্ট্র হচ্ছে তিনিই আমাকে রক্ষা করছেন। আমি তো পাপিনী,—পাপিনী তার শাস্তি ভোগ করছি। আজ তিনি [বৃন্দাবন] কোথাও অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন, আর আমি কোন খবর পাচ্ছিনে! পাপ করেছি আমি, আর দুঃখ পাচ্ছে অন্য কেউ। আমি যদি তাঁর ঠিকানা পেতাম তাহলে কি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতাম না? মাতে বলছিল—পাপ শুধু এই জন্যই খারাপ নয় যে তাতে নিজেরই নরক-ভোগ হয়, খারাপ এই জন্য যে তার দুর্গন্ধে আমারও শ্বাসকষ্ট হয়। এই কথা তিনি সাধুসন্তদের মুখ থেকে শুনে ছিলেন, মিথ্যে হতে পারে না। আমারি পাপে তাই তিনি দূরে বিদেশে একলা কষ্ট পাচ্ছেন। আমারি পাপ তাই এখানে মাতেকে [অজিতকে] আমার জন্য মাথা হেঁট করতে হচ্ছে।

যমুনার চোখে জল এসেছিল, এখন তা গণ্ড বেয়ে পড়তে লাগল।

রূপার খুব বিস্ময় বোধ হল। যমুনাকে সে খুবই শ্রদ্ধা করত। কেউ যমুনার বিরুদ্ধে কিছু বললে তার সঙ্গে ঝগড়া করে প্রতিবাদ করত। কিন্তু এ কি, যমুনা নিজেই নিজের মুখ দিয়েই নিজেকে পাপিনী বলছে। মনে মনেই বলল, খুব সত্যি কথা, কে কেমন করে জানবে কার মনে কি আছে, কে কেমন।

[২৯]

রাধে ডাকল, কাকী, ও কাকী!

ভিতর হতে উত্তর এল, কি খবর, রাধে ভাই?

যমুনা তক্ষুনি বেরিয়ে এল। রাধে ভয়ে ভয়ে বলছিল

বলল, হল্লী ফৌজদারী করেছে।

ফৌজদারী করেছে ?

হীরাকে মারছিল, আধমরা করে ফেলেছে।

তোমরা সবাই কেন বাধা দিলে না ?

আমরা কেউ তার কাছে ঘেঁষতে পারিনি। যে বাধা দিতে যেত তাকেই সে মারত। তাছাড়া হল্লীর দোষও ছিল না। হীরা লজ্জার কথা বলে। বিশ্রী কথা বলে।

যমুনা চলে যাবার উপক্রম করছিল, রাধের সব কথা শুনবার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল।

রাধে বলল, হল্লী নিরর্থক রাগেনি। কেউ যদি কাউকে গালি দেয় তা হলে কি সে চুপ করে শুনবে ? হীরা বলতে লাগল, আমি গাঁয়ের মোড়ল, জমিদার। তুমি নীচ জাতের। তোমাকে এই বালক বয়সেই এমন জব্দ করেছি যে না মরা পর্যন্ত ভুলবে না। সারা জীবন তোমাকে এমনি করে নাকে দড়ি দিয়ে যদি না জব্দ করি তা হলে বোল।

যমুনা বলল, এই কথায় এত মারধর করবার কি আছে ?

রাধে বলল, এই-ই শুধু বলেনি। যা বলছিল সে-সব কথা বলবার নয়।

যমুনা ঐদিকে যাবে ভাবছিল, কিন্তু গেল না।

কিছুক্ষণ পরে দেখতে পেল হল্লী আসছে। মাটিতে ধ্বস্তাধ্বস্তি হওয়ায় কাপড়ে-চোপড়ে, গায়ে যে ধুলা-মাটি লেগেছিল তা যথাসাধ্য মুছে এলেও, কোন কোন জায়গায় তার দাগ তখনও ছিল। আঁচড়ে গিয়ে এক হাতের কনুই রক্তাক্ত ছিল। জামা ছিঁড়ে গিয়েছিল। মনে না জানি কিসের চিন্তা, কি পীড়ার বোঝা এসে চেপেছে। যেন সে বাল্যদশাকে অনেক পিছনে ফেলে রেখে, বার্দ্ধক্যের চরম দুঃখের ও ক্লান্তির বোঝা নিজের মাথায় বহন করছে।

যমুনা ভেবেছিল যে হল্লীকে এই কাণ্ডের জন্য বকাবকি করবে না। এমন ভাব দেখাবে যেন এ-সব ব্যাপার সম্বন্ধে সে কিছুই জানেনা। কিন্তু ছেলের এই অবস্থা দেখে তার ক্রোধ জেগে উঠল। সে-ক্রোধ হল্লীর প্রতি ছিল না, কিন্তু তা পড়ল গিয়ে হল্লীর উপরই।

সে বলল, কিরে, কতবার বুঝিয়েছি, বলেছি কারও সঙ্গে ঝগড়া করিস না! তবু শুনিস না, এইবার হল তো। ওখানে মেরেছিস, এখানে আমি তোমাকে ঠেঙাব।

হল্লী দাঁড়িয়ে রইল, নড়ল না। সে বলল, বেশ তুমিও ঠেঙাও। সকলের কাছেই মার খাবার জন্যই তো আছি।

যমুনা মারবার জন্য হাত তুলেছিল কিন্তু মারল না। বলল, হীরালালকে কেন মেরেছিস?

হল্লী বলল, এখনও পিটুনি দিইনি কিন্তু এমন পেটাব, দেখে নিও! যাই যাব, তবু তাকে না পিটিয়ে ছাড়ব না।

যমুনা স্তম্ভিত হল। হল্লীর এমন উদ্ধত মূর্তি ইতিপূর্বে সে দেখেনি। একটু ধমক দিলেই ও জড়-সড় হয়ে এক কোনায় গিয়ে দাঁড়াত। কিছুক্ষণ পূর্বেও যে-ভাব ওর মধ্যে ছিল না সে-ভাব কোত্থেকে এল? যমুনা বলল, তুই আবার তার সঙ্গে ঝগড়া করবি?

হ্যাঁ, তাকে আবার ঠেঙাব।

অনেকদিন হল মারিনি, এই কথা বলে যমুনা তাকে এক চড় মারল। হল্লী এমন ভাবে রেগে দাঁড়িয়ে রইল যেন তার কিছুই হয়নি।

মাতা কঠোর নয়। ছেলেকে ধমকায়, মারে, কিন্তু এর দুঃখ সেও কম পায় না। হল্লীকে টেনে এনে বুকে জড়িয়ে ধরল। সস্নেহে পিঠ চাপড়ে বলল, আজ তুই কেন এ-রকম হলি, বল।

মায়ের হাতের এই স্নেহময় পিঠ চাপড়ানিটা তার কাছে মায়ের হাতের চড়ের চেয়েও বেশি মনে হল। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, বলল বটে, কিন্তু ছাড়া পাবার কোন চেষ্টা করল না।

যমুনা তাকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল, কাঁদিস না! ভালো ছেলেরা কারও সঙ্গে ঝগড়া করে না।

হল্লী বলল, তুমি আমাকে কেন মারলে? আমি তো কোন খারাপ কাজ করিনি।

তুইই তো হীরালালকে মেরেছিস। তার সঙ্গে তোর না বনলে, তার কাছে যাসনে।

হল্লী আবার রেগে উঠল। বলল, তাকে যেখানে পাব সেখানেই ঠেঙাব। কেন সে খারাপ খারাপ কথা বলে? বলে, হল্লী অজিতের ছেলে। আমার মায়ের সম্বন্ধে কেউ খারাপ কথা বললে তার জিভ টেনে বার করে ফেলব।

যমুনার চোখে জল এল। সে জোর করে সামলে নিল পাছে ঐ জল ফোঁটা-ফোঁটা হয়ে পড়ে। চোখের জল সুখের কিম্বা দুঃখের, কে জানে সে কথা। যমুনাও জানে না কেন এই অশ্রু! এই টুকুই জানে যে তার মনের কানায় কানায় কিছু ভরে উঠেছে, সেটা ওখানে আর ধরছে না, বাইরে ছাপিয়ে উঠছে। মুখ ফুটে যমুনা কোন কথা বলতে পারলনা, —আরও শক্ত করে দু হাত দিয়ে হল্লীকে জড়িয়ে ধরল।

মায়ের আবেগ হল্লীর কাছে গোপন রইল না। সে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, মা, কেঁদনা, তোমাকে কেউ যদি কিছু বলে আমি দেখে নেব তাকে। আমি কাউকে ভয় করি না। বাবা নাই তো কি হয়েছে, আমি তো আছি। অজিন্তই এই কুৎসা রটিয়েছে। তাকে আর এ-বাড়ীতে আসতে দেব না। তুমি ভয় পেয়োনা। লাঠি হাতে আমি পাহারা দেব, দেখি কেমন করে সে আসে।

কিছুদিন পরের কথা। হল্লী আর হীরার ঝগড়ার কথা পুরাতন হয়ে গেছে। চৌধুরী পরিবারের পক্ষ হতে যে-ক্রোধ এবং তাড়নার ঝড় উঠেছিল, তারও দাপট শান্ত হয়ে গেছে। তবুও যমুনা মন দিয়ে কোন কাজ করতে পারছেনা। সে উদাসিনীর মতো। হল্লী স্কুলে গিয়েছে। এদিক-ওদিকে পায়চারি করে সে স্থির করল কূপ থেকে জল তুলে আনবে। এর কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কিছু না করলে কাজ চলবে কেমন করে? কলসীর জল আধ-ভরা জালায় ঢেলে দিয়ে, জল তুলবার জন্য দড়ি-টড়ি নিয়ে বাইরে যাবার উপক্রম করা-মাত্র শুনতে পেল, বাইরে কেউ ডাকছে, যমুনা মাতৌন আছেন?

এই কণ্ঠ-স্বর ডাক-পিওনের! যমুনার বুক ধড়াস করে উঠল। হাতের জিনিস নিচে রেখে সে তাড়াতাড়ি বাইরে গেল।

পিওন বলল, একটা বেয়ারিং চিঠি আছে, চার পয়সা দিতে হবে।

চিঠি! চার পয়সার বেয়ারিং, এজন্য তো যমুনা সব কিছু দিতে পারে,

আরও বেশি কেন চাইলনা। এর জন্য নিজের সব কিছু দিতে সে প্রস্তুত।

চিঠি দিয়ে পিওন চলে গেল .নিয়ে যমুনার হাত-পা কাঁপতে লাগল—এর মধ্যে কি আছে? প্রথম চিঠির জবাব না পেয়ে উনি এই চিঠি লিখেছেন। কে জানে, তিনি কত বিরক্ত হয়েছেন। কি জানি, আমার সম্বন্ধে তিনি কি ভাবছেন। কুশলে আছেন তো? ভগবান সহায়, কেনইবা কুশলে থাকবেন না! তবু তিনি কি লিখেছেন?

যমুনার শিরায় শিরায় রক্ত চলাচল দ্রুত হয়ে উঠল। চিঠিতে কি লেখা আছে, কোথেকে এল?/ কোন অশুভ সংবাদ তো নয়? ভালো সংবাদ হোক আর মন্দ হোক—হাতের নিয়তির রেখাগুলির মতন সামনে দেখতে পেয়েও তখন বুঝতে পারে না।

কি জানি হল্লী কখন স্কুল থেকে ফিরবে। স্কুলের ছুটি হয়ে যাবার পরও বাড়ী ফেরার পথে কোথাও হয়তো আটকে যেতে পারে। তার কোন নিশ্চয়তা নাই কখন আসবে। কিন্তু এই চিঠি তো তাকে দিয়েই পড়িয়ে শুনতে হবে। তাহলে সে না আসা পর্য্যন্ত ধৈর্য ধরে এইখানেই বসে থাকি।

তবু যমুনা নিজের সিদ্ধান্তে দৃঢ় হয়ে থাকতে পারলনা। কাউকে দিয়ে চিঠিটা পড়িয়ে নেবার জন্য বাড়ী হতে বেরিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে যখন সে ফিরল তার চোখে ছিল উন্মাদের লক্ষণ। বাড়ী হতে বেরিয়ে পথে তার সঙ্গে রাধের দেখা হয়েছিল। হাতের লেখা চিনতে পেরে চিঠিটা পড়ে রাধে বলল, যে-চিঠি যমুনার নাম দিয়ে হীরা হল্লীর বাবাকে লিখেছিল এ-চিঠি সেই চিঠি। ঠিকানা ইংরাজীতে লেখায় হয়তো কিছু ভুল ছিল সেই জন্য বেয়ারিং হয়ে প্রেরকের নামে ফিরে এসেছে। সব ব্যাপার বুঝতে পেরে যমুনা তখনি মতিলালের বাড়ীতে দৌড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তখন তিনি কিছুদিনের জন্য বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন।

হল্লী দৌড়তে দৌড়তে এল। এসেই অস্বাভাবিক স্বরে জিজ্ঞেস করল, কোথায় আছে হীরার লেখা সেই চিঠি? দাও তো, আমি এখনি গিয়ে তাকে দেখছি!

অজিত বলল, বউদি আজ মুখ মিষ্টি করাও, বল, কথা দিচ্ছ?

সবিস্ময়ে যমুনা জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কি?

তুমি কথা না দিলে বলব, এমন ভালো মানুষ আমাকে মনে কোরনা। আগে কথা দাও, পরে যদি খুশী না করতে পারি তখন বোল।

অজিতের মুখে-চোখে উল্লাস দেখা যাচ্ছে। যমুনার যেটা সর্বাপেক্ষা বড় আকাঙ্খা, সেই বিষয়েই তার মনে চিন্তার উদয় হল। কিন্তু অন্তরে কি একটা সন্দেহ থাকায় সে আশ্বস্ত হতে পারলনা। উদাস স্বরে বলল, এমন ভাগ্য কি আমার আছে যে কারও মুখ মিষ্টি করাব?

অজিত ভাবল, যমুনার মনে হীরার চিঠির আঘাত আছে। তাই সে বলল, সেই চিঠির জন্য এত দুঃখ কেন বোধ করছ? চুলোয় যাক সে চিঠি। আমি অন্য সংবাদ—আচ্ছা, তাহলে এখনি শুনিয়ে দি—সদর শহরে বৃন্দাবন ভাই এসেছেন, বিকেলের ট্রেনে এখানে আসবেন।

এসেছেন। যমুনা ঐখানেই কারও উদ্দেশে উপরের দিকে দু-হাত জোড় করে তারপর মাটিতে নিজের কপাল ঠেকাল। অজিত লক্ষ্য করল তার দুই চোখ দিয়ে জল পড়ছে। অজিতের হৃদয়ও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। সে বলল, বউদি তুমি এতদিন তো দুঃখে কেঁদেছ, আর আজ আনন্দে প্রসন্ন হবার দিনেও কাঁদছ।

বগলে বইয়ের থলি নিয়ে হল্লী স্কুল থেকে ফিরল। অজিতকে দেখামাত্র তার প্রসন্নভাব কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। কোন দিকে না তাকিয়েই গট-গট করে সোজা সে ভিতরের দিকে চলল। অন্য কোন তাকে থলেটা না রেখে উঠানেই কোথাও আজ রাখবে।

অজিত বলল, শোন হল্লী! আজ এমন খবর দেব যা শুনে খুব খুশী হবি।

হল্লী ঘুরে অজিতের দিকে তাকাল। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় যমুনা বলল, উনি কি বলছেন শোন। উনি বলছেন, তোর বাবা এসেছেন।

হল্লীর বিশ্বাস হল না। সে জিজ্ঞেস করল, কোথায় আছেন? হয়তো ভুলোচ্ছেন।

যমুনার সংস্কারে আঘাত লাগল। মিথ্যে মনে করল সত্যি সত্যিই শেষে শূন্য হাতেই না থাকতে হয়, সত্যটাও মিথ্যে না হয়ে যায়! তাই সে বলল, নারে, সত্যি।

একদিকে থলেটা ফেলে দিয়ে সে চট্ করে মাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, কোথায় আছেন মা, বল কোথায় আছেন? আমি বলেছিলাম কিনা, দেখ।

অজিত বলল, আমার কাছে আয় তাহলে বলব।

ক্ষণেকের জন্য হল্লীর দ্বিধা হল, তার পরই গিয়ে অজিতকে জড়িয়ে ধরল। বলল, বল তিনি কোথায় আছেন,—সদরে, তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবার জন্য আমি যাব। মা চলুন, আর তুমিও চল, কাকা! খুব ঘটা করে তাঁকে নিয়ে আসব।

কিছু সময় কেটে যাবার পর অজিত সেই লোকটিকে সঙ্গে করে নিয়ে এল, যে সদর শহরে বৃন্দাবনকে দেখেছিল। সে বলল—যখন সে তহশীল কাছারী হতে ফিরছিল, সেই সময় এক জায়গায় একটা টাঙায় বৃন্দাবনকে দেখতে পায়। সঙ্গে জগরাম আর অন্য একজন ছিল। জগরামের সঙ্গে ছিল বলেই তার দিকে দৃষ্টি গেল, নইলে সে বৃন্দাবনকে চিনতে পারতনা। বৃন্দাবনের কপালে বড়-বড় তিলক, মাথায় সাধুদের মতন কান ঢাকা টুপী ছিল। অমনি সে দৌড়ে টাঙার দিকে যাওয়া-মাত্র বৃন্দাবনও তাকে চিনতে পারল। বৃন্দাবন ব্যস্তভাবে কোথাও যাচ্ছিল তাই তার সঙ্গে বিশেষ কোন কথা-বার্তা কিছু হয় নি।

সন্ধ্যার সময় ট্রেন আসে। অত ক্ষণ প্রতীক্ষা করা কঠিন। প্রতীক্ষায় যমুনার বছরের পর বছর কেটে গেছে, কিন্তু আজ এখন অল্প কয়েক ঘণ্টাই তার পক্ষে অর্থই হয়ে উঠল। হল্লী কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে রেল-ষ্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। যমুনা একাই বাড়ীতে আছে। এই একান্তে তার মনে কত রকমের চিন্তা আসা-যাওয়া করছে। কিছুদিন ধরে তার মনে শান্তি ছিল না। এই জন্য সে উঠানের ফটকের দিকটা গোবর দিয়ে নিকোতে পারেনি। সে জানে তিনি তো আজ আসবেনই। হঠাৎ কখন তিনি এসে পড়তে পারেন এই আশায় বছরের পর বছর সব রকমে প্রস্তুত থাকত। আজ তাঁর আসবার দিন—আর আজই উঠান-টুঠান

কিছুই লেপা-পোঁছা হয়নি। একবার তার মনে হল যে এখনো সময় আছে, লেপা-পোঁছা করা যেতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই এই চিন্তা তার ভাল লাগল না। ভাবল যে-অবস্থায় যা আছে, তেমনি থাক। সেজে-গুজে তাঁকে অভ্যর্থনা করা ঠিক হবেনা।

শ্বশুরের কথা মনে পড়তে লাগল তার।—হল্লীর সাথে এঁকে তিনি আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন। আমার প্রতি তাঁর আস্থা ছিল। কি জানি কী গুণ তিনি আমার মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন। আমার কোন গুণই নাই,—কিছুই নাই, অল্পেই আমি ঘাবড়ে যাই; অল্পেই আমার মন অস্থির হয়ে ওঠে। আমি কী আর করতে পারতাম, আমার কী-ই বা ক্ষমতা ছিল। যা কিছু হয়েছে তাঁরই আশীর্ব্বাদে হয়েছে, তাঁর সুকৃতির জন্য হয়েছে। এখনো এলেন না, কি হয়েছে তাতে? এটা তো জানতেই পারা গেছে যে তিনি ভাল আছেন; যে সংকট ছিল তার অবসান হয়েছে। তবু আমি দুঃখে কেন এত অধীর হচ্ছিলাম? বজ্রের মতন যা কঠিন ভাবতাম তা ফুলের মতন স্পর্শ করে গেল আমাকে। ভগবান আমাকে দেবতার মতন শ্বশুর দিয়েছিলেন। এমন যদি না হত, তাহলে কি হত? ঊর্দ্ধে স্বর্গ থেকে তিনি আজ সব কিছুই হয়তো দেখতে পাচ্ছেন। আমার মনে হচ্ছে সত্য-সত্যই তিনি আমার মাথায় তাঁর হাত রেখেছেন।

যমুনার ইচ্ছে হচ্ছিল এই সময় কাঁদতে। অন্য কেউ এসে তার কাছে বসে, তার এই একান্তের সুখে বাধা দেয়,—এটা সে চাচ্ছিল না।

[৩১]

ট্রেন এল এবং চলেও গেল। যে কয়েকজন ঐ ট্রেন থেকে নামল বৃন্দাবন তাদের মধ্যে ছিল না। হল্লী এই জন্য দুঃখের চেয়েও বেশি লজ্জা বোধ করল। সে ভাবল হেঁকে-ডেকে কেন সে এতগুলি ছেলেকে সঙ্গে এনেছিল? একলা চুপ-চাপ এলেই বা কি ক্ষতি হত? কিন্তু তাঁর মনে তো আনন্দ হয়েই ছিল। সেই আনন্দের উল্লাসকে না প্রকাশ করেই বা সে থাকত কেমন করে? তবু তার পিতা এলেন না। এখন সে কাকে কি বলবে বুঝতে পারছেনা। আকাশের মত নির্লজ্জতা তার

নাই। হঠাৎ কোথাও হতে ঘোর ঘনঘটা এসে খুব গর্জন করে, বারি বর্ষণ না করেই অল্পক্ষণ পরেই অদৃশ্য হয়ে গেলে, আকাশের তাতে কি আসে যায়? সে আবার পূর্বের মতন রৌদ্রালোকে প্রস্ফুট হয়ে হাসতে পারে। হল্লীর দ্বারা এমনটা কেমন করে হতে পারে? তার খুব কান্না পাচ্ছে। কিন্তু উপায় নাই, এতগুলি ছেলের সামনে কাঁদতেও পারে না।

তৈরী করে সঙ্গে এনেছিল ফুলের মালা। সে দেখেছিল স্কুলে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি এলে তাঁকে পুষ্পমাল্য দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এই পুষ্পমাল্য তখনো তার হাতেই ছিল। তার ইচ্ছে হল সেটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে কোথাও ফেলে দেয়।

একটি ছেলে বলল, তাঁর কাছে পয়সা থাকলে তো ট্রেনে চেপে আসবেন? হেঁটেই আসবেন।

হল্লী কিছু আশ্বাস পেল। যখন আর কিছু থাকেনা তখন ছেঁড়া জীর্ণ বস্ত্র পরেও লজ্জা নিবারণ করতে হয়।

রাধে বলল, আমি বলিনি যে অজিতকে বিশ্বাস করি না। তোমার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হবার জন্যই অজিত এই ভাঁওতা দিয়েছে।

সংক্ষেপে হল্লী বললে, ঠিক বলেছ।

হল্লী কিন্তু সত্যি কথা বলেনি। তার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে তার বাবা আসেনি। তবুও লজ্জিত মনের আগুনকে চাপা দেবার জন্য এই ছাইও এই সময় তার সহায় হল।

কিছুক্ষণ পরে সে বলল, আজ মঙ্গলবার, এই দিনে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করতে নাই, তাই তিনি আসেন নি।

রাধে হেসে ফেলল। বলল, ঐ অজিতের কথাই কপচাচ্ছ?

হল্লী জেনেশুনেও অজিতের নাম গোপন রাখতে চাচ্ছিল, কিন্তু রাধের কাছে তা করা সম্ভব হলনা। তার উপদ্রবের হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য ওখান থেকে সে চলে গেল।

অজিতের মনে সন্দেহ হল। কিছুদিন ধরেই মতিলাল চৌধুরী স্থানান্তরে ছিলেন, বাড়ী ছিলেন না। পূর্বে এক দিন তাঁর সঙ্গে অজিত দেখা করতে গিয়ে জানতে পেরেছিল। তখনি তার মনে হঠাৎ আশঙ্কা হয়েছিল, তবু তখন সেই আশঙ্কাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। এখন সেই

আশঙ্কা তার মনে প্রবলভাবে জেগে । এ অবস্থায় কিছু না করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিছুক্ষণ পরে, সদরে একটি গাড়ী যাচ্ছে দেখে সে তাতে উঠে পড়ল।

রাত্রেই সে চেষ্টা করেছিল বৃন্দাবনের খোঁজ নেবার। কিন্তু শহরে কোথাও বৃন্দাবনের খোঁজ পায় নি। অগত্যা নিরুপায় হয়ে পরের দিনের জন্য প্রতীক্ষা করতে হল।

পরের দিন জগরামকেই খুঁজে বার করতে তার বেশ সময় লাগল। যে-বাড়ীতে জগরাম আগে থাকত এখন আর সে-বাড়ীতে থাকেনা, অন্য বাড়ীতে থাকে। অজিত সেই বাড়ীর সন্ধান পেল, কিন্তু যখন সে ওখানে গেল তখন জগরাম বাড়ীতে ছিল না।

দ্বিতীয়বার যখন জগরামের বাড়ীর দিকে যাচ্ছিল, সেই সময় পথে মতিলাল চৌধুরীকে দেখতে পেল, সে চেঁচিয়ে ডাকল—চৌধুরী, ওহে চৌধুরী, শোন তো।

অজিতের দিকে ফিরে চৌধুরী বললে, কেন? এখন আমি ব্যস্ত। অন্য সময় দেখা করব।

এই কথা বলে দ্রুতগতিতে গন্তব্যপথে চলে গেল। অজিত ভাবল মতিলাল পাশ কাটিয়ে পালাতে চাইছে। ধরে দুটো কথা কেনই বা জিজ্ঞেস করব না? আবার ভাবল, থাকগে, যাক। আমি সন্ধান করে নেব।

যে-উকিলের কাছে মতিলালের কাজ-কর্ম হয়, তার কাছে অজিত গিয়ে উপস্থিত হল। উকিলবাবু তখন তাঁর বৈঠকখানায় ছিলেন না। কয়েকটি ব্যক্তি তাঁর প্রতীক্ষায় বেঞ্চিতে বসে বিড়ি ধরিয়ে নিজেদের মধ্যে আস্তে আস্তে কথাবার্তা বলছিল। কাঠের ডেস্কের উপরে কাগজ রেখে এক জন মুন্সী কিছু লিখছিলেন। আগন্তুকের পায়ের শব্দ পেয়ে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেন, কি জন্য? মকর্দ্দমা?

অজিত বলল, মকর্দ্দমা নয়, মতিলাল চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

মাথা নিচু করেই মুন্সী আবার লিখতে লাগলেন। লিখতে লিখতেই তিনি বললেন—এখানে নাই।

অজিত বলল, এখানে তো এসেছিলেন, কোথায় গেলেন?

কোথায় গেলেন, সকলের কথার জবাব দিতে হবে আমাকে? যাও, বিরক্ত কোরনা।

বেঞ্চে যারা বসে ছিল তাদের মধ্যে একজন বলল, মুন্সীজী কেন রাগ করছেন, ভালো ভাবে কেন উত্তর দিচ্ছেন না?

মুন্সী লেখা বন্ধ করে বললেন, হুজুরের মুখ খুলেছে। এখানে বসে যদি কলম ঘসতে হয় তাহলে বুঝতে পারবে। এখন তো বলছ মুন্সীজী এমন করেন, তেমন করেন, এর পর যখন লেখার জন্য টাকা দিতে হবে তখন চেঁই-মেঁই করবে, বলবে, এই ওকালৎনামা লেখার পারিশ্রমিক খুব বেশী। ভালো করে জবাব দেব কেমন করে? সকালেই সেই কিপটের খোঁজ করতে এসেছেন! ভাগ্যে আজ অন্ন জুটলে হয়। কে তার নাম করে? কাল তারই একটা দলিল রেজিষ্ট্রীর ব্যাপারে সারাদিনটাই দিলাম, আর যখন মুন্সীজীর প্রাপ্য দেবার সময় হল তখন ঝাড়া জবাব দিলে—হাতে আর অবশিষ্ট কিছু নাই, আবার আসব। বরাবরই ধারে তার কাজ চলে। আমার উকিল বাবুর কাছে এমনি সব ধারলেনেওয়ালাই এসে জোটে, অন্য কোথাও যাক, তখন বুঝবে।

কথাবার্তা শোনবার জন্য অজিত বেঞ্চিতে বসে পড়ল।

একজন মক্কেল জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ, মুন্সীজী, তার সেই সম্পত্তি বিক্রীর দলিল রেজিষ্ট্রী হয়ে গেছে? সেই ক্ষেত আর কুয়ার?

উকিলবাবুর আসতে দেরী ছিল। মুন্সীজীও এই অবসরে একটি বিড়ি ধরালেন আর বললেন, হয়ে গেছে। হবেনা কেন, আমি যে সঙ্গে ছিলাম। আমি না থাকলে কাজ প্রায় ভণ্ডুল হবার মতন হয়েছিল, রেজিষ্ট্রার নানা রকম আপত্তি তুললেন। খুবই হয়রানি হয়েছিল। একবার তো আমি ভাবলাম—কেন আমি মাথা ঘামাই, এই রকম মানুষের কাজ ভণ্ডুল হওয়াই উচিত। আবার ভাবলাম উকিলের পক্ষে এটা অনুচিত, তিনি যদি মক্কেলের সহায় না হন তাহলে মক্কেল বেচারা যাবে কোথায়। আমি তো মনে করি, আমার বিচার আমার, তার বিচার তার।

পাকা-পাকি সব হয়ে গেছে?

দ্বিতীয় একজন মক্কেল জিজ্ঞেস করল, কিসের মামলা ছিল?

প্রথম জন বলল, মামলা আর কিসের? ধারলেনেওয়ালারা ঋণদাতার চোখে ধুলো দিতে চায়। বৃন্দা নামে একজন মতিলালের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিল। তারপর সে কোথাও চলে গেল, অনেকদিন কেটে গেল। তার স্ত্রীর কাছে মতিলাল নিজের প্রাপ্য টাকার জন্য তাগাদা দিল। কিন্তু আজকালকার দিনে তাগাদায় কে কান দেয়। সেই স্ত্রীলোকটি আর একজনের সঙ্গে এখন ঘর করছে; ছেলেও হয়েছে, আট-দশ্ বছর বয়স তার। চালাকী দেখ মেয়েটার, অন্য লোকের সঙ্গে ঘর করছে আর প্রথম স্বামীর কুয়ো-জমি-জমা আঁকড়ে বসে ছিল। আইন-কানুন রোজই বদলাচ্ছে, লেখা-পড়ায় আইনের গলদ হয়তো হয়ে থাকবে, মতিলাল কিছুই করতে পারেনি। এতদিন পরে সম্প্রতি, সে জানতে পারল যে বৃন্দাবন কোথাও বেঁচেই আছে। জানতে পেরেই সে অমনি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। বৃন্দাবন বাড়ী ফিরে আসবার কথাই চিন্তা করছিল। নিজের স্ত্রী-দেবীর এইসব কাণ্ড-কারখানা শুনে বেচারার বড়ই দুঃখ হল। সে টাকাকর্জের কাগজ ঐখানেই লিখে দিল। কিন্তু মতিলাল ভাবল ঐ কাগজ কি মধু দিয়ে চাটবে। মতিলাল তাকে কোনরকমে রাজী করে এখানে নিয়ে এল, আর গতকাল ক্ষেত, কুয়ো সব নিজের নামে লিখিয়ে দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়ে নিয়েছে। এই জায়গার প্রতি বৃন্দার এমনি বিতৃষ্ণা হয়েছে যে হয়তো কখনো এখানকার নামও আর মুখে আনবে না। রেজিষ্ট্রীর কাজ সেরে সে তক্ষুণি এখান থেকে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এটা খাঁটি সত্য যে মতিলাল যদি বুদ্ধি খাটিয়ে এই কাজ না করত তাহলে ওর পাওনা টাকা ডুবেই যেত। আজকাল কারো সঙ্গে লেন-দেনের ধর্ম আর নাই।

অজিত বলল, সব মিথ্যে।

মিথ্যে কেমন করে হবে? কাল এখানে উকিল বাবুর সামনেই তো কথা হচ্ছিল।

অজিত বলল, উকিলবাবু কি পরমেশ্বর যে তাঁর সামনে মিথ্যা কিছু ঘটতে পারে না?

মুন্সী বললেন, কে হে তুমি, যে এমন বেয়াদবের মতো কথা বলছ?

বেয়াদবী অন্য কেউ হয়তো করে, আমি সত্য বলছি। আমার নাম অজিত।

তুমি-ই অজিত?

মুন্সী আর সেই লোকটি পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসল।

অজিত বলল, হ্যাঁ, আমিই অজিত। এই স্ত্রীলোকটি অন্য কারো সঙ্গে ঘর করে নি। তার সঙ্গে খুব প্রবঞ্চনা করা হয়েছে।

মুন্সী বললেন, যদি প্রবঞ্চনাই করা হয়ে থাকে তাহলে যাও আদালতে গিয়ে দরখাস্ত কর। এটা উকিলসাহেবের কামরা, এখানে ধীরে ধীরে সংযত ভাবে কথা বলতে হয়।

সেই মক্কেলটি বলল, বন্ধু, অনেকদিন ধরে তো ক্ষেত আর কূপের মুনাফা ভোগ করেছ, এইবার বেচারা মহাজনের প্রতি দয়া কর। এখন আর দরখাস্ত করে কোন ফল হবে না। এখনি তো মুন্সীজীর কাছে শুনলে যে করণীয় যা সব পাকাপাকি ভাবে হয়ে গেছে। সেই স্ত্রীলোক আর নিজের ছেলেটিকে নিয়ে এখন অন্য পথ দেখ, মামলা-মকর্দ্দমায় অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু হয় না।

অজিত বলল, ঐ ছেলেটি বৃন্দাবনেরই। খুব বড় রকমের জালিয়াতি করা হয়েছে। আমি উকিলবাবুর সঙ্গে আলোচনা করব।

মুন্সী বললেন, এই পয়েন্টটা ভাল। যদি কোর্টে প্রমাণ করতে পার যে ছেলেটি স্ত্রীলোকের প্রথম স্বামীর পুত্র, তাহলে প্রতিবাদ কিছুটা চলতে পারে। সম্ভবত ক্ষেত কূয়ো তোমার দখলে থেকে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের উকিলবাবু তোমার এই মামলায় উকিল হতে পারেন না, কেননা তিনি অন্য পক্ষের উকিল।

অজিত কাছারীতে গিয়ে জানতে পারল যে সত্য-সত্যই বৃন্দাবন এসেছিল এবং ক্ষেত আর কূয়ো বিক্রী করে দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়ে আবার কোথাও চলে গেছে।

[৩২]

জানতে পারা গেছে যে দুই-এক দিনের মধ্যেই আমিন এসে ক্ষেত আর

কুয়োতে যমুনার দখল যে আর নাই, তার ব্যবস্থা করে যাবে। যমুনার দখলে ঐ সম্পত্তি থাকবে না।

যমুনার কাছে এই সমাচারের কোনই গুরুত্ব ছিল না। ভাদ্রের মেঘলা রাতের দু-একটি অবশিষ্ট নক্ষত্র, মেঘে কোথাও ঢাকা পড়ে গেলে কিম্বা মিট-মিট করলে, কেউ তা লক্ষ্য করে না। সেগুলি প্রকাশিত হয়ে থাকায় আর অপ্রকাশিত থাকায় রাত্রির কি আসে যায়? যমুনা এই সংবাদ কানেই শুনল মাত্র।

এদিকে ছয়-সাত দিন ধরে হল্লী ছিল খুব অসুস্থ। রাতদিন যমুনাকে জেগে থাকতে হয়েছে। ছেলের জ্ঞান ছিল না, সে ঐ অবস্থায় অজিত আর হীরার নাম ধরে প্রলাপ বকছিল। এই কারণেই হল্লীর ঐ অসুস্থতার সময় অজিত কোন সাহায্যই করতে পারেনি। তাকে দেখলেই রোগীর প্রলাপ বেড়ে যেত।

স্বামী এসে ফিরে যাবার যে-আঘাত সে পেয়েছিল তার পরেই ছেলের এই অসুখ এল তার কাছে। বিপদের পর বিপদ আসে। এর কি কোন অর্থ আছে? একটি রেখার সামনে আর একটি রেখা না টানলে প্রথম রেখাটির গুরুত্ব কমে না। যমুনার প্রথম দুঃখরেখা ছোট হোক কিম্বা নাই হোক, তবু এটা সত্য যে এই ক'দিন তার সমস্ত ধ্যান দ্বিতীয়টিতেই কেন্দ্রীভূত হয়ে ছিল।

এখন হল্লীর জ্বর নাই, সে পথ্য পেয়েছে, তবু তাকে খুব বেশি ঘুরে বেড়াতে দেওয়া হয় না, পাড়ায় সামান্য এদিকে-ওদিকে বেড়াতে দেওয়া হয় মাত্র।

সে একদিন বললে, মা, লোকেরা বলছে কূয়ো আর ক্ষেত এখনো আমাদের হাতেই রাখা যেতে পারে। আমাকে সাহেবের কাছে গিয়ে দরখাস্ত করতে হবে।

যমুনা বলল, তুই এ-সব বিষয় বুঝিসনা, এখন এ-সব কিছু করিসনা।

আমি না বুঝলেও আমার সঙ্গে উকিল থাকবেন, তুমি থাকবে। উকিল ইংরাজী ভাষায় হাকিমকে সব কথা ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন।

যমুনা কোন উত্তর দিল না। এজন্য হল্লী সাহস করে আবার বলল,

সকলেই বলছে, আমাদের খুব ঠকানো হয়েছে, প্রবঞ্চিত করা হয়েছে। হাকিম কি এই কথাটুকু বুঝতে পারবেন না?

আমি তোকে পরে বলব। এখন এ-সব কথা চিন্তা করিসনা—চিন্তা করলে আবার শরীর খারাপ হবে।

খারাপ হবে না। পরে বলবার সময় আর কোথায়? আমিন তো আসছে।

আসছে তো আসুক, এলে দেখব। এখন তোর জন্য পথ্য তৈরী করব।

আজকাল হল্লীর ক্ষিদে বেড়ে গেছে। পথ্যের কথায় প্রসঙ্গ বদলে গেল।

সন্ধ্যার সময় যমুনা পাড়ায় বেরিয়ে ছিল,—বেরিয়েই হঠাৎ সে ক্ষেতের দিকে এগিয়ে গেল। কোন অদমনীয় ইচ্ছা তাকে ঐদিকে টেনে নিলে। সেই ইচ্ছার বিরুদ্ধতা সে করতে পারে নি।

সেখানে সব কিছুই পূর্ববৎ, কোথাও ভিন্নতা নাই। সেই বাঁধানো কূপ, কূপের পাশে সেই আমের গাছ, সেই ক্ষেত, সেই মাটি সেই রকমই আশে-পাশের সবুজ সবুজ গাছ, সেই পাকদণ্ডী, আর আগের মতনই পাকদণ্ডী পথে এদিকে-ওদিকে যাওয়া-আসা করছে মানুষ। আজ সন্ধ্যার লালিমায় না আছে একটুও কালো রঙ আর না আছে আজকের বাতাসে পূর্বের তুলনায় অধিক কিছু উষ্ণতা। সব যেমন ছিল তেমনিই আছে। কারো কানে যেন পৃথিবীর কোন খবর পৌঁছয়নি! সকলেই এমনি নিষ্ঠুর, এমনি নির্দয়।

শূন্য মনে যমুনা এধারে-ওধারে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। কূপের কাছে আসামাত্র তার মনে হল একবার কিছুক্ষণের জন্য সেখানে বসে। কিন্তু বসতে গিয়েও তখনি বিরক্তি বোধ হওয়ায় আর সেখানে বসল না। যে-স্থানকে সে এতদিন নিজস্ব মনে করেছিল, আজ সেখানে কি সে তেমন করে বসতে পারে যেমন করে পথিক সেখানে কিছুক্ষণের জন্য এসে বিশ্রাম করতে বসে? যদি বিশ্রাম করতেই হয় তাহলে সে অন্য জায়গায় বসবে।

আমগাছের তলায় এসে দাঁড়াল। চেয়ে দেখল উপরে ডালে দু-একটি

ফল ঝুলছে। উপরে আছে বলেই এখনো আছে। এই বৃক্ষের প্রতি তার কত মোহ ছিল। কত স্নেহে কলসী কলসী জল এর গোড়ায় দিয়েছিল। ধীরে ধীরে সেই চারা গাছ এত বড় হয়েছে যে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে হয়। এ-গাছ আজ আর তার নয়, বড় হয়ে গেছে, মাতার স্নেহ-ভালবাসার আর প্রয়োজন কি? নিজে রোজগারে করে খেতে সক্ষম কঠোর পুত্রের মতন, অন্যের কাছে গিয়ে মাকে মনে পড়বে না এর। সংসারে পুরুষ মানুষই শুধু নির্দয় হয় না। পশু-পক্ষী, গাছ-পালা সব কিছুর মধ্যে একই রকমের প্রকৃতি।

যমুনা ক্লান্ত ছিল। এইবার গাছে ঠেসান দিয়ে বসল। এই গাছ তারই। কেউ কেড়ে নিক, তবু এইটুকু নিজের অধিকার সে ছাড়বেনা। যে যা বলুক, কিছুতেই ছাড়বেনা নিজের দাবী।

রাত্রির অন্ধকার এসে পড়েছে। পাশের পাকদণ্ডী পথ দিয়ে কয়েকটি কৃষক যুবক কোন গানের একটা কলি এক সঙ্গে গাইতে গাইতে চলে গেল। গানের ধ্বনি দূরে গিয়ে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে, সেখানকার নীরবতায় বিলীন হয়ে গেল। বিলীন হয়েও একেবারে বিলীন হয়নি। যমুনার অন্তরে গিয়ে তা কাঁদতে লাগল,—বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।

যমুনার মনে পড়ল এই সুরেই তো সে-দিন তারা গান গাইছিল। অনেক দিন পুর্বের কথা। তবু তার ভাল করেই মনে পড়ছে। মেলায় যাবার দিন ছিল। এই পথ দিয়েই অনেক গোরুর গাড়ী মেলায় যাচ্ছিল। ঐসব গাড়ীর লোকেরা এই সুরেই গান করছিল। কোন একটি ছেলের তৃষ্ণা পাওয়ায় কূয়োর কাছে একটি গাড়ী থেমে ছিল। যমুনার গাড়ীও মেলায় যাবার জন্য ঐখানেই ছিল। যে-গাড়ীটি এসে থেমে ছিল সেই গাড়ীর থেকে একটি যুবতী নেমে এসে যমুনার পতির সঙ্গে এমনভাবে হাস্য পরিহাসময় কথাবার্তা বলছিল যা যমুনার মোটেই ভাল লাগেনি। তার ভাল লাগছে কিম্বা খারাপ লাগছে কে দেখেছে তা? ঐ গোরুর গাড়ীর পেছনে পেছনে যমুনার পতির গাড়ীও চলল। পথে যাওয়া-আসার সময় বেশ আনন্দ-উল্লাস ছিল। কথায়-বার্তায় উভয়ের মধ্যে একটা আত্মীয়তার সম্বন্ধের পরিচয়ও পাওয়া গেল। এই ঘটনার পর ঐ যুবতীর সঙ্গে যমুনার স্বামী মাঝে মাঝে দেখাও করত, যমুনা তাও জানে। যমুনা সে-যুবতীর

চেহারা ভোলেনি। বিদেশেও স্বামীর সঙ্গে এই রকম কোনো যুবতীর সংস্রব ঘটেছে, যমুনা এও কল্পনা করেছে। নীল বুটীদার আঁচলা, ঘের দেওয়া ঘাঘরা, কপালে ঝক্‌-ঝকে টিপ, হাতে-পায়ে রূপার কিছু অলঙ্কার।

গানের সুরের সঙ্গে যমুনার মনের সামনে হঠাৎ ঐ যুবতী এসে দেখা দিল। অন্ধকারে তার টিপ এমন ভাবে ঝিলিক দিচ্ছে যেন কোন প্রদীপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

যমুনা উঠে দাঁড়াল এবং অস্থির ভঙ্গীতে এদিকে-ওদিকে পায়চারি করছে, এখন তাকে বলবার কইবার কেউ নাই। তার অন্তরের মুক্ত নারী সব বাধামুক্ত হয়ে স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে। যেন স্থানকালের বোধ আর তার নাই।

কোথায় আছ, মা?

যমুনা চমকে উঠল। এ যে হল্লী! অসুস্থতা-জনিত দুর্বলতা সত্ত্বেও কেমন করে এখানে এল? সে চেঁচিয়ে উত্তর দিল, আমি এখানে আছি, এখানে! এখান পর্য্যন্ত কেমন করে এলি?

উভয়েই কিছু এগিয়ে পরস্পরের কাছে গিয়ে পৌঁছল। যমুনা হল্লীর পিঠে হাত দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, অন্ধকারে ভয় পাসনি তো? আমি ফিরেই যাচ্ছিলাম। তুই কেমন করে টের পেলি যে আমি এখানে আছি?

ছেলের বিশ্রাম প্রয়োজন মনে করে যমুনা তাকে নিয়ে কুয়োর উপরে গিয়ে বসল। এখানে এখন বসতে তার সংকোচ হল না। এই অন্ধকারে নিচে মাটিতে ছেলেকে বসতে দেবে না। মাটিতে পোকা-মাকড় কত কি থাকতে পারে।

হল্লী বলল, আমি বুঝতে পেরেছিলাম, তুমি এইখানেই আছ। তাই আর থাকতে পারলাম না, চলে এলাম।

অন্ধকারে সুস্পষ্টভাবে কিছু দেখা যাচ্ছিল না, তবু যমুনা অনুভব করল যে ছেলের মুখে বেদনার চিহ্ন রয়েছে। ভালই হল যে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না—সুস্পষ্ট না দেখেই ছেলের দুঃখে তার বুক ফেটে যাচ্ছে।

হল্লী বলল, আমার মনে হল আমি তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছি। এই কথাই বলবার জন্য এই সময় চলে এলাম। বিরক্ত হোয়োনা মা।

বাছা আমার, তুই আমাকে কষ্ট দিচ্ছিস না। তোর জন্যই তো বেঁচে আছি—অশ্রু-ভারে যমুনার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল।

কষ্ট দিই। তুমি বলেই সেটা মনে করনা। অন্য কেউ হলে আমাকে পিটিয়ে পিটিয়ে ঠিক করে দিত। তোমাকে আর কষ্ট দেব না ভেবেছি।

কি ভেবেছিস রে ?

এই ভেবেছি যে, আমি বাবা বাবা বলে কেঁদে মরি, আর উনি এত খারাপ মানুষ। খারাপ কাজ করে নিজে তো জেল খেটেছেনই, আর অনর্থক তোমাকে এত কষ্ট দিলেন।

যমুনা নির্বাক হয়ে বসে রইল। তার এই মনের বেদনা ছেলেটি কেমন করে বুঝতে পারল? এই প্রশ্নটাই তার মনে ছুঁচের মতন বিঁধছিল। কিন্তু কী লজ্জার কথা যে এই অবোধ বালকের কাছেও এটা প্রকাশ পেল, মুখ দেখান যায় না !

হল্লী বলল, আর আমি কিছু মনে করব না। যে যা বলে বলুক, আমি আর ভয় করি না। মা, এখন তুমি এই বাড়ী ত্যাগ কর। আমরা অজিত কাকার বাড়ীতে এখানকার চেয়ে ভালই থাকব। এ বাড়ীতে দুঃখ কষ্টে তুমি বেঁচে থাকতে পারবেনা। আর আমি নিজের বাবাকে বাবা বলবনা।

যমুনা শিউরে উঠল, আমার জন্য এ কত গভীর বিষয় চিন্তা করছে। কত মহৎ এর মন। আমারই ছেলে তো বটে। হঠাৎ তার মনে প্রশ্ন উঠল—আমারই একার ছেলে কেমন করে হয় ?

আমার কথা গ্রাহ্য করবে মা ?

এ কেমন ছেলেমানুষী কথা !

ছেলেমানুষী কথা ! ছেলেমানুষীর কথা কি কেবল হল্লীই শুধু বলে ? সে নিজেও তো ছেলের এই প্রস্তাবের বিষয়ের মতই কিছু ভাবছিল। সব বয়স্ক ব্যক্তিরাও নিজেদের বিবেচক মনে করে ছেলেমানুষদের মতন অনেক কাজ করে। হল্লীর কত অসঙ্গত কথা, কত অসঙ্গত খেলা যমুনার মনে দ্রুতভাবে ক্ষণেকের জন্য জেগে উঠল। সে তার জন্য কতই না দুঃখ বরণ করেছে, কত না উপদ্রব সহ্য করেছে। এরি মতন অন্যরাও। সে কার উপরে আজ রাগ করবে ? কেমন মূর্খ সে ! প্রতিদিন চোখের

সামনে সব কিছু দেখেও এ-কথা তার মাথায় এখনো কেন এল না? অন্য কারও সম্বন্ধে কিছু নির্ণয় করবার শক্তি তার নাই। স্বয়ং যদি তাকে কষ্ট সহ্য করতে হয় সে করবে, তার বিচারে অন্য কারও প্রতি অজ্ঞাত অন্যায় কেন হবে? অন্যের সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানই বা কতটুকু। এ-বিষয় সকলেই হল্লীর সমপর্যায়ের! বলা হয় প্রত্যেক ব্যক্তি ঈশ্বরের সৃষ্টি। এই জন্য সে ঈশ্বরের মতনই রহস্যময়। ঈশ্বরকে অনুভব করবার মতই কষ্ট সহ্য করেই তারও উপলব্ধি করতে হবে। এই-ই উচিত, এই-ই করণীয়। বাস্তত অনায়াসে আমরা যা কিছু পাই তা প্রায়ই সত্য হয় না।

একটা কিছু যমুনার অন্তরে দীপশিখার মত দীপ্ত হয়ে উঠল। একটি ক্ষণের জ্যোতির বাণী যা কিছু ওকে বলে গেল, তার ভাষার সঙ্গে ওর পরিচয় নাই। না থাকুক; তবু তার সংকেত বুঝতে ওর বিলম্ব হয়নি। সেই অপরিচয়ও ছিল চির-পরিচয়ের মতন। যেন কত বছর ধরেই সে তাকে চিনেই আসছে।

সে উঠে বলল, এরকম কথা বলিসনা হল্লী। অজিতের বাড়ীতে গেলেও তোর বাবা তোরই বাবা থাকবেন। এই সত্য কেউ বাতিল করতে পারে না। সহ্য কর, শক্ত হয়ে এটা সহ্য করে নে। কেন দুর্বল হচ্ছিস? যত বেশি সহ্য করতে পারবি ততই তুই উন্নত হবি।

হল্লীর হাত ধরে সে চলল। আকাশ মেঘে ঢাকা। চতুর্দিক অন্ধকারে ঢাকা, শুধু অন্ধকার। কোথাও কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তবু ছেলের হাত ধরে সে এগিয়েই যাচ্ছে। আজই শুধু একা যাচ্ছে না। ঐ চিরন্তন নারী যুগ-যুগের অন্ধকারে, তাকে তুচ্ছ করে, চিরকাল ধরে এমনি করেই সামনে এগিয়েই চলছে,—দুঃখ আর বিপত্তির এই অন্ধকার পথকে এমনি করেই পদদলিত করে! তার নাই কোন ভয়, নাই কোন চিন্তা।